আযাদী সংখ্যা

আলাপনী

সচিত্র কিশোর-মাসিক

সম্পাদক
আবদুল ওয়াহেদ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সুন্দর হ'তে সুন্দরতম
করে তোলে—
পলমল
টয়লেট সাবান
PALMAL
PALMAL
সিরকো
সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ ঢাকা
পূর্ব পাকিস্তানের সোল এজেন্টস জেমস ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম
EVERGREEN

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক যাবতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত [No. 3909/7-S dated 23.8.55]

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
উন্নত থাক পতাকা মোদের—	সাহেদ লতিফ	...৫১৫
আযাদীর দিন—	আঃ কাঃ সাঃ নূর মোহাম্মদ	..৫১৭
জন-যুদ্ধ—	মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ	...৫১৯
মাতা সায়র—	কাদের নওয়াজ	...৫২৩
আলেফ লায়লার গল্প—	অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন	...৫২৫
ব্যস্ত রবি—	জলি রহমান	...৫২৮
গল্প হ'লেও সত্যি—	অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী	...৫৩০
খুকুমণির জন্মদিনে—	আশরাফ সিদ্দিকী	...৫৩১
নূতন ও পুরাতন—	মুহম্মদ সুলতান	...৫৩২
আপাভাই—	মিন্নাত আলী	...৫৩৩
অনশন—	বদিয়স সালাম	...৫৪০
সিন্দাবাদ—	আবুল হাসান	...৫৪১
খোকার কীর্তি—	শ্রী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য	...৫৪২
জাগরণ—	আসমা চৌধুরী	...৫৪৬

* * *

আযাদী উৎসবের দিনে তরুণ জাতির আবালবৃদ্ধ-বনিতা জেনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন যে তাঁদেরই সেবার প্রতিজ্ঞায়—

পাকিস্তানে দ্রুত অগ্রগতির পথে

পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি

প্রিমিয়ার ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী অফ পাকিস্তান লিঃ

হেড অফিস :
ম্যাকলিউড রোড, করাচি-২
পূর্ব পাকিস্তানে
জীবন বীমার জন্য

বিনা দ্বিধায় খোঁজ করুন

৪১, জিন্নাহ্ এভিনিউ
রমনা, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা

১৫। আষাঢ়ের বৃষ্টি—কাজী হাসান আমিন …৫৪৭

১৬। রবার্ট লুই স্টিভেনসন—আবু হেনা …৫৪৮

১৭। একটি কবর—দিল আরা মিনু …৫৫১

১৮। রহস্যের অন্তরালে—ভগদত্ত খীসা …৫৫২

১৯। নিজেকে নিজে—মোজাফ্‌ফর হোসেন …৫৫৬

২০। বিড়ম্বনা—রফিকুল হক …৫৫৭

২১। মিন্টুর ম্যাজিক—মিসবাহুল আজিম …৫৫৮

২২। মায়ার বাঁধন—এম, এ, হাসেম খান …৫৬১

২৩। বর্ষা রাণী—নূরুল ইসলাম কাব্যবিনোদ …৫৬৪

২৪। ন' মামার কাণ্ড—আলফারুক …৫৬৫

২৫। ফুল ও মূল—প্রবাল …৫৬৯

২৬। সাহিত্য ও কিশোর সমাজ—আঃ কাঃ মনজুর মোরশেদ …৫৭০

২৭। বাইশে শ্রাবণ—এ, বাশির …৫৭৩

২৮। বোবা—হেমায়েত হোসেন …৫৭৪

২৯। একটি আশ্চর্য গুহা—চৌধুরী ওসমান …৫৭৫

৩০। নতুন শপথ—সৈয়দ হুমায়ুন বখ্‌ত …৫৭৯

কবিরাজ এম, সাহা, এম, বি, বি, এস, এ ; ভিষগশাস্ত্রীর

"ফিভারেট"

একমাত্রা সেবনের সাথে সাথে জ্বর-দানব "ফ্লু" হয় ধ্বংস ; আক্রান্ত মানুষ পায় নূতন জীবনীশক্তি, ফিরে পায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু। "ফিভারেট" যাদুমন্ত্রের মত সর্ববিধ জ্বর আরোগ্য করে। জ্বরে আক্রান্ত হবার পরেও ফিভারেট সেবন করলে ১ ঘণ্টার মধ্যে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে—ইহা সুনিশ্চিত।

সেবন বিধি :—পূর্ণ বয়স্ক ১-২ বটিকা ; শিশু অর্ধ বটিকা গরম জলসহ প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

—পরিবেশক—

লিবার্টি ড্রাগ এণ্ড কেমিকেল কোং

পদ্ম মলম হাউস : নরসিংদী, ঢাকা। (পূর্ব-পাক)

ছোট হতে বড় হবার প্রেরণা যোগাবার মত একখানা বই, যা পূর্ব পাকিস্তানের ছোট বড় সবারই অবশ্য পড়া উচিত

ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশান্সের সহযোগিতায় প্রকাশিত

সৈয়দ আবদুল মান্নান কৃত

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন

মূল্য—এক টাকা বার আনা

—প্রাপ্তিস্থান—

মজিদ পাবলিশিং হাউস,

১৪।১৫, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩১।	মধ্য রাতের খুন—	কুয়াশা	...৫৮০
৩২।	ইন্দ্রজাল—	যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার	...৫৮৫
৩৩।	হে পাক ওয়াতান মোর হে পাক নিশান—	কাজী গোলাম আঃ	...৫৮৭
৩৪।	সমুদ্রের গভীরে—	আবু কায়ছার	...৫৮৮
৩৫।	আসিয়াছে সেই দিন—	মোঃ আঃ খালেক জোয়ারদার	...৫৯০
৩৬।	রূপকুমার—	বদিউজ জামান	...৫৯১
৩৭।	আশার কথা—	নূরুল আবসার	...৫৯৪
৩৮।	এস খেলার কথা শোনাই—	আবদুস সালাম	...৫৯৫
৩৯।	আযাদীর এই দিনে—	মোঃ আঃ হক চৌধুরী	...৫৯৭
৪০।	যোগাযোগ—		...৫৯৮
৪১।	শপথ—	নাসির উদ্দীন আহমদ	...৬০১
৪২।	ম্যাজিক শেখ—	যাদুরাজ এস্, ডি, মুখার্জী	...৬০২
৪৩।	ধাঁ-ধাঁ		...৬০৩
৪৪।	সেরা পাকিস্তান—	ব'নজীর আহমদ	...৬০৫
৪৫।	জেনে রাখ—	মোঃ আঃ করীম	...৬০৯
৪৬।	দাঁড়ির কবিতা—	মেনহাজ উদ্দিন চৌধুরী	...৬১০
৪৭	সম্পাদকের দফ্‌তর—		...৬১১

মনের মত বই

কে না পড়ে

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের

দুই মহল (উপন্যাস) ৩৷৷০

দুই হৃদয়ের তীর (গল্প) ২৷০

সরদার জয়েন উদ্দীনের

বীরকণ্ঠীর বিয়ে (গল্প) ২৷৷০

খরস্রোত (গল্প) ২৲

জাহাঙ্গীর খালেদের

এক টুকরো হাসি (গল্প) ২৲

আতহার আহমদের

উন্মোচন (উপন্যাস) ২৲

আফজল হোসেনের

ডাক বাঙলা (গল্প) ২৷৷০

মোহম্মদ ওয়লিউল্লাহর

ফাঁসীর মঞ্চে ২৲

কাজী আফসার উদ্দীনের

জীবন শিল্পী শেখভ ২৷৷০

আজিজুর রহমান চৌধুরীর

জয়নবের আত্মকথা ৩৷০

ছোটদের উপযোগী—

আরো বই

পাঁচসিকা সিরিজ—

মৃত্যুজাল, লেফটেন্যাণ্ট হত্যা, প্রতিহিংসা কিড্‌ন্যাপডটর, পেটোবোট, মৃত্যুর অভিশাপ, রহস্যময় বন্দী, কিডন্যাপড, গ্রেট এক্সপেক্টেশান, সাইলাস মারনার, কাঠের পুতুল, টমব্রাউনের ছেলেবেলা, সোহরাব-রুস্তম, আমাদের কায়েদে আযম।

অন্যান্য বই

লায়লা মজনু ৩৲, শিরী ফরহাদ ২৷৷০, হযরত বড় পীড় সাহেবের জীবনী ২৲, অমর জীবন (হযরতের জীবনী) ২৷০, আবুবকর ৸০, বিষাদ সিন্ধু ৬৲।

কোহিনূর লাইব্রেরী

ঢাকা : পাকিস্তান

এল মহাম্মদ এণ্ড কোং

২৫, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

বিভিন্ন প্রকারের শাড়ী, মশারী, বেড্-সিট, কুশেন কাপড়, টাউয়েল, শতরঞ্চি ও হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের অপূর্ব সমাবেশ।

খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়।

—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

ভিক্টোরিয়া ফাইন আর্ট প্রেস

১নং, তাঁতিবাজার, ঢাকা।

ভাল ছাপার কাজে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে যাবতীয় স্কুল-পাঠ্য পুস্তক, লেজার বুক, ক্যাশ বুক, লুজ-লিফ্, ফরম, চেক, স্কুলের প্রশ্নপত্র ইংরেজী ও বাংলায় অতি সুলভে সুচারুরূপে ছাপা হয়।

=পরীক্ষা প্রার্থনীয়=

পড়ুন সেরা বই পড়ুন

যৌনরহস্য—ডাঃ কলিমুদ্দীন আহ্‌মদ

মনে পড়ে—মরহুম এম, আবদুল হাই

ভুলোনা আমায়—রেয়ায্ উদ্দীন আহ্‌মদ

অদৃষ্টের পরিহাস—মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

আশ্চর্য আর আশ্চর্য—ব'নজীর আহমদ

মোনাজাতে মাকবুল—শেখ আবু আহ্‌মদ

একেই বলে ভাগ্য—মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মন যারে চায়—মুহাম্মদ ইব্রাহিম

মিলন রাত—চৌধুরী আব্বাস উদ্দীন

ফোরটুয়েন্টি (৪২০)—মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

তুমি আজ কত দূরে—মীর মোশাররফ হোসেন

রূপকথার ঝুলি—কাজী তাযাম্মুল হোসেন

ঃ বিশ্বরহস্য সিরিজ ঃ

ঃ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ঃ

প্রত্যেকখানা এক টাকা

রক্তলেখা ১ নং

রাত্রি যখন তিনটে বাজে ২ নং

উড়ন্ত বিমানে দুরন্ত ডাকাতি ৩ নং

ড্যাগার যখন বিঁধলো বুকে ৪ নং

মৃত্যুদূতের কবলে ৫ নং

হীরার সন্ধানে গোয়েন্দা ৬ নং

নীল আলোর সংকেত ৭ নং

রয়েল লাইব্রেরী

৮৫, ইস্‌লামপুর, ঢাকা।

মনের খোরাক যোগাতে হ'লে চাই

ভাল ভাল বই

সে সমস্যার সমাধান করতে এগিয়েছে—

পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন

৭৩।৭৪, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

কবি বন্দে আলী মিয়া রচিত—

ময়নামতীর চর (কাব্য)

মূল্য—আড়াই টাকা।

'ময়নামতীর চর' সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—"..... কাব্যখানিতে পদ্মাচরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল। পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই।..... "

জোয়ার ভাটা (নাটক)

মূল্য—পাঁচ সিকা।

নারী রহস্যময়ী (উপন্যাস)

মূল্য—দুই টাকা।

'পথিক' রচিত—

নজর

আমাদের সমাজ-জীবনের বহু গুপ্ত এবং লুপ্ত কথা বইখানির মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে; যে জন্য বইখানি সকলের কাছে লোভনীয় হয়ে পড়েছে। মূল্য—আড়াই টাকা

আলম কোরায়শী রচিত—

অমাবস্যার আতঙ্ক—১৷৷০

(রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ)

মোঃ নজরুল ইসলাম রচিত—

অজানা দ্বীপে—১৷৷০

(নতুন টেক্‌নিকের এডভেঞ্চার)

গজনফর আলী রচিত—

ভাব-বিলাস—১৷৷০

(গল্পসমষ্টি)

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচয়িতা **রেয়াযউদ্দিন আহমদ** রচিত—

ছায়া-মানব সিরিজের ১নং বই—**দস্যু ছায়ামানব**—১৷৷০

আমাদের এখানে স্কুল-কলেজের যাবতীয় পুস্তক প্রচুর পরিমাণে সর্বদা মওজুদ থাকে। মফস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সুবর্ণ সুযোগ

বাহির হইল! বাহির হইল!!

Matric English Unseens

By—**S. K. Gupta, M. A. & J. N. Das, B. A.**

ইংরেজী ২য় পত্রে (Second Paper) ভাল নম্বর পাইতে হইলে ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক। আজই ইহার এক কপি কিনুন এবং নির্ভয়ে আগামী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন।

Pakistan Book Corporation.

73/74, Patuatooly, Dacca.

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

রোমাঞ্চকর কয়েকখানি ডিটেক্‌টিভ বইয়ের সিরিজ :—

কে,টি, সাহেবের নব অবদান—

সদ্য প্রকাশিত "ভুলু ডাকাত সিরিজ"

- **ভুলু-ডাকাত** সিরিজ নং ১ দাম ১৷৷০
- **ভুলুর কীর্তি** ,, ,, ২ ,,
- **বন্দী-ভুলু** ,, ,, ৩ ,,
- **ভুলুর প্রেম** ,, ,, ৪ ,,
- **আজমীরের পথে ভুলু** ,, ,, ৫ ,,
- **মায়ের কোলে ভুলু** ,, ,, ৬ ,,
- **ফাঁসীর মঞ্চে ভুলু** ,, ,, ৭ ,,

কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ সাহেবের কয়েকখানি ভালো বই

- **নূতন প্রেম** ১৷৷০ উপন্যাস
- **বাতাসী** ১৸০ ,,

মৌলবী মুজাহারুল ইসলাম সাহেবের একখানি ভালো বই

- **মাটির ফসল** ২৸০

আবদুল হাই সাহেবের একখানি ভালো বই

- **দশ জান্নাতী** ১৷৷০

মৌলবী ইসমাইল হোসেন সাহেবের রচিত—

হযরত আদম (আঃ) হইতে সমস্ত পয়গম্বরদের জীবনী

- **পয়গম্বর বৃত্তান্ত বা আম্বিয়া কাহিনী** ১৸০

বেগম জেবু আহ্‌মদের রচিত—

- **পাতাল কারার বন্দী**
- **অভিশপ্ত মূর্তি**
- **টর্চের আলো**

মোসাম্মাৎ জিন্নাতুন্নেছা খানমের রচিত—

- **মোসলেম সতী** ১৷৷৵০

একমাত্র প্রকাশক :

লিয়াকত পাবলিশিং কোং

১২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।

ও

পূর্ব-বাংলার প্রত্যেক লাইব্রেরীতে পাইবেন।

বিনীত—ম্যানেজার

কিশোর সাহিত্য সিরিজের ডিটেক্‌টিভ বই—

শ্রেষ্ঠ শিল্পী অঙ্কিত ছবি, মনোরম ছাপা, অপূর্ব গেট-আপ ও উজ্জ্বল বহির্সৌষ্ঠবে ঝল্‌মল! কাছে পাইলে হাতছাড়া করিবার ইচ্ছা হইবে না,— পড়িয়া শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি থাকিবে না। ছেলে-বুড়ায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে।

পাতায় পাতায় নূতন রহস্য, শিহরণের পর শিহরণ, বিভীষিকার পর বিভীষিকা, গুপ্তহত্যার গোলক ধাঁ ধাঁ—জালিয়াতীর অপূর্ব নৈপুণ্য, ডিড়িৎ-কর্ম তরুণ ডিটেক্‌টিভের অসামান্য বুদ্ধি-চাতুর্য, রহস্যভেদে অলোক-সামান্য প্রতিভা আপনাকে বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও অভিভূত করিবে।

স্বনামখ্যাত স্বপন কুমারের—

১। ছদ্মবেশী মায়াবিনী— ১৲
২। বার্মা ফেরত দস্যুনেত্রী— ৸৹
৩। মিস সবিতা হত্যা-রহস্য— ৸৹
৪। দুঃসাহসী জালিয়াত— ৸৹
৫। নিশীথের খুনা— ৸৹
৬। ট্রেনে ডাকাতি— ৸৹

সমীর কুমার ঘোষের—

১। কাল্ কেউটে— ১৷৹
২। কালো মুখোশ— ১৲
৩। হত্যার প্রতিশোধ— ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত—

১। ভূত আর অদ্ভুত— ৸৵৹
২। মোহনপুরের শ্মশান— ৸৵৹
৩। প্রেতাত্মার প্রতিশোধ— ৸৵৹

শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস অনূদিত—

লর্না ডুন— ১৲

সুন্দর ও অনবদ্য প্রেম-কাহিনী।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হারাধন মুখোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সামাজিক উপন্যাস—নূতন সাথী— ১৸৹

সত্যিকারের প্রেম সর্বজয়ী। পথের শত বাধা-বিঘ্ন, প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহ, নির্মম সামাজিক অনুশাসন কিছুই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না—স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যায়। কিশোরী কমলার নির্মল প্রেম তাহার প্রমাণ।

তরুণ ঔপন্যাসিক—কিশোর সাহিত্যের যশস্বী লেখক—সমীর কুমার ঘোষের—দেনা পাওনা— ৩৲

অর্থ গৃধ্নুতা মানুষের স্নেহ-মমতা ও বিবেক-বুদ্ধিকে কি ভাবে পর্যুদস্ত করে তাহা প্রত্যক্ষ করুন। পাপ ও পুণ্যের, প্রেম ও করুণার এমন সুন্দর আলেখ্য কদাচিত দেখা যায়।

সুসাহিত্যিক কৃষ্ণগোপাল বসাক প্রণীত—

রিক্তের বেদন— ৩৷৹

প্রকৃতির অভিশাপে যাহার চোখের আলো চিরজীবনের জন্য নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে, জীবনের সোনালী মুহূর্তে যাহার চোখে অমা-নিশার ঘোর অন্ধকার স্থায়িভাবে নামিয়া আসিয়াছে তাহার রিক্ত ও ব্যথিত জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী—।

ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স
৩৯, পাটুয়াটুলী, ঢাকা—

বাহির হইল ! বাহির হইল !!

আল্‌হাজ্জ মৌঃ মোহম্মদ শামসুল হক সাহেবের

অমর অবদান—

তাযকেরাতুল আওলীয়া বঙ্গানুবাদ

সুবিখ্যাত সুফী দরবেশ মরহুম শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তারের প্রসিদ্ধ ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ।

প্রথম খণ্ড ঃ ৫৲ টাকা ও দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশক ঃ সোবহানিয়া লাইব্রেরী

৭৯ নং ইসলামপুর, ঢাকা।

মজিদ পাবলিশিং প্রেস

২।২, রাজার দেউড়ী, ঢাকা

আমাদের প্রেসে ইংরেজী, বাংলা ও উর্দূ টাইপে নানাপ্রকার পুস্তক, জব ওয়ার্ক, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও ইউনিয়ন বোর্ডের যাবতীয় ফরম অল্পসময়ে অতি সুন্দররূপে ছাপা হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত

ম্যানেজার

আমাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ

ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশানের সহযোগিতায় প্রকাশিত অনুবাদ

ছাপা, কাগজ ও অঙ্গ-সজ্জায় যুগান্তকারী কয়েকখানি মূল্যবান বই—

বইয়ের নাম	লেখক বা অনুবাদক	দাম	প্রকাশক
বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন	সৈয়দ আবদুল মান্নান	১৸০	মজিদ পাবলিশিং হাউস, ১৪।১৫, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
স্মাইডার রচিত 'টেলিফোন কি করে কাজ করে'।	কাজী আফসার উদ্দীন আহ্‌মদ	২৷৷০	ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিকেশান, ১৫, কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ঢাকা।
ইভাগ্রাণ্ট রচিত 'সহযোগী হিসাবে শিক্ষক ও অভিভাবক'	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	১৷৷০	ঐ
বার্ণেট রচিত 'বিশ্বরহস্যে আইনষ্টাইন।'	অধ্যাপক এম, এ, জব্বার	২৲	মল্লিক ব্রাদার্স ৩, বাংলাবাজার, ঢাকা।
এ্যালেন-পো-এর শ্রেষ্ঠ গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড	মহীউদ্দীন আহ্‌মদ	২৷৷০	বার্ডস এ্যাণ্ড বকস ৪, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ঢাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

ছোট থেকে বড়	যারাহ কে বোণ্টন ও সিরাজুদ্দীন হোসেন	পূর্বাচল প্রকাশনী ৬৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা।
ষ্টেইনবেক রচিত 'অন্তরাগ'	মহীউদ্দীন আহ্‌মদ	বার্ডস এ্যাণ্ড বকস্ ৪, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ঢাকা।
হথর্ন রচিত 'রক্ত আঁখর'	সিরাজুর রহমান	সাহিত্য প্রকাশনী ১, কে, জি, গুপ্ত লেন, ঢাকা।
ও' হেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প	ঐ	ঐ
সিনক্লেয়ার লুই রচিত 'এ্যারো স্মিথ'	আবদুল হাফিজ	
মুনরো লীফ রচিত 'হতে হবে বীর পালোয়ান'	আশরাফুজ্জামান।	
মুনরো লীফ রচিত 'মজার মজার অংকগুলো'।	অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী। ঐ অধ্যাপক এম, এ, জব্বার।	
মুনরো লীফ রচিত 'রাজা বাদশা হাথার মানুষ'।	কবি আহ্‌সান হাবীব।	
মুনরো লীফ রচিত 'দুনিয়াটা হাতের মুঠোয়'।	অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী।	

এবং আরও অনেকগুলি বই।

আপনার নিকটস্থ পুস্তকালয়ে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি প্রকাশককে লিখুন।

ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশানস্

২৯, পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা।

Just Out ! **Just Out !!**

The Best Help Books
for Matric Students

By A Board of Examiners

1. The Essentials of English Grammar & Composition.
2. Secret of Bengali Grammar & Composition.
3. Sure Success in Islamic History.
4. Notes on Galpabithi (for 1959)

To be had of :—
All the principal book-shops of Dacca and Mofussil.

বুক কোম্পানী

—পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১৪নং, বাংলা বাজার, ঢাকা

আমাদের এখানে স্কুল ও মাদ্রাসার যাবতীয় পুস্তক প্রচুর পরিমাণে মওজুদ আছে। মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

—প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত আরও একটি বই—

—নীহার রঞ্জন ঘোষাল প্রণীত

"কাজী বাড়ীর পুকুর"

ছেলেমেয়েদের মনের মত গল্পের বই
এবং যে বই একবার পড়িতে
বসিলে শেষ না করিয়া
উঠা যায় না।—

আজিজ-উর-রহমান রচিত

স্বাপ্নিক

দাম মাত্র—দেড় টাকা

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

১২, ইসলামপুর :: ঢাকা

মোবারক লাইব্রেরী

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১১৫, ইসলামপুর, ঢাকা।

স্কুল-কলেজের যাবতীয় পাঠ্য-পুস্তক, টেক্সট-বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী—এতদ্ব্যতীত ম্যাপ, সিলেকশন ও বিভিন্ন গ্রন্থের নোট বই প্রচুর পরিমাণে মওজুদ আছে।

পাইকারদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

——পরীক্ষা প্রার্থনীয়——

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি বই

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন প্রণীত—

১।	পাকিস্তানী ছড়া ও ছবি	···	···	মূল্য ৸৹
২।	মহাকবি ইক্‌বাল	···	···	„ ৷৵৹
৩।	দানবীর মোহ্‌সীন	···	···	„ ৷৵৹
৪।	স্যর সৈয়দ্‌ আহমদ	···	···	„ ৷৵৹

এস, এম, ইসহাক প্রণীত—

জ্ঞান-সিন্ধু— „ ৪৲

মোসাম্মৎ সালেহা খাতুন প্রণীত

—পতিভক্তি—

মেয়েদের উপহার দেওয়ার একখানি আদর্শ বই। ঝক্‌ঝকে ছাপা, রঙীন প্রচ্ছদপট, মজবুত বাঁধাই। মূল্য—১৷৹

ফারূক লাইব্রেরী ঃঃ রাজশাহী

আযাদীর এই স্মরণীয় দিনে শুভেচ্ছা জানায়—

- নিখুঁত ব্লক
- ঝক্‌ঝকে ছাপা
- মনোমত ডিজাইন

এর জন্যে

রাইজিং আর্ট কটেজ

১০৩, তাঁতি বাজার
ঢাকা

এই যদি ছিল মনে

মূল্য—দুই টাকা।

মন হারা'ল যে

(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

মূল্য—তিন টাকা।

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সাহার দুইখানি মন মাতানো বই- সর্বত্র পাওয়া যায়।

ষ্টুডেন্টস্‌ বুক সাপ্লাইং কোং

(আড়ানী, রাজশাহী)

দিনাজপুর খা'জা নাজমুদ্দীন মুসলিম হল হ'তে প্রকাশিত বাংলা-মাসিক

নওরোজ

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা। ১৩শ বর্ষ চলছে। হিন্দু-মুসলিম সেরা সাহিত্যিকগণই এতে নিয়মিত লিখে থাকেন। বার্ষিক মূল্য ৪৷৹ আনা। নমুনা সংখ্যা ।৵৹ আনা। বিজ্ঞাপনের হার সস্তা।

ম্যানেজার :—**নওরোজ,** দিনাজপুর।

THE ELEPHANT BOY EXERCISE BOOK

STUDENTS LIKE THIS EXERCISE BOOK

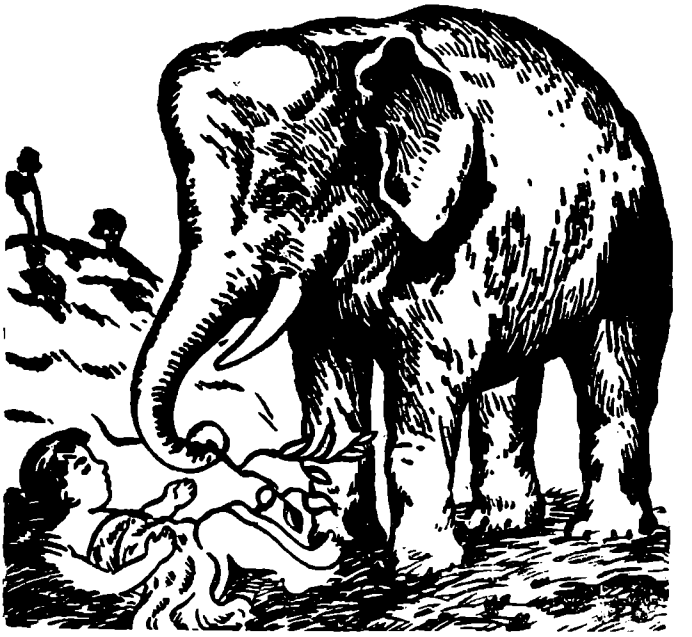

REMEMBER THE ELEPHANT BOY

Sole Distributors :
Hafiz Mohammad Musa & Co.
34, Sowari Ghat, Dacca .

Manufactured by :
Cosmopolitan Traders
4, Nowabganj Road, Dacca.

এম, তাইনুস এণ্ড সন্স

৩নং সোয়ারীঘাট, ঢাকা

আমাদের এখানে

সর্ব প্রকার কাগজ, খাতা, এক্সারসাইজ বুক, ইন্‌ভেলাপ, রাইটিং প্যাড্ বিক্রয়ার্থে মওজুদ আছে। মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিঃ দ্রঃ—আমাদের "নৌকা" মার্কা এক্সারসাইজ বুক লোকের নিকট সুনাম অর্জন করিয়াছে।

দি পেপার হাউস

১৪, বাংলা বাজার, ঢাকা

আমাদের এখানে সকল প্রকার বিদেশীয় কাগজ ও ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যাবতীয় স্কুলের ফরম, রেজিষ্টারী বুক, জমিদারী দাখিলা, হাবেলী ভাড়ার দাখিলা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

আমাদের এখানে ড্রইংয়ের যন্ত্রাদি ও প্রেসের কালি মওজুদ রাখা হয়। মফস্বলের অর্ডার পাইলে যত্ন-সহকারে মাল পাঠান হয়।

সুলভ লাইব্রেরী

দিনাজপুর ও বগুড়া (পূর্ব-পাকিস্তান)

আমরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার যাবতীয় পুস্তক নাটক, নভেল, ধর্ম-গ্রন্থ, ইউনিয়ন-বোর্ড ফর্‌ম, যাবতীয় রেজিষ্টার বহি অতি সুলভে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি।

—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

টাউন লাইব্রেরী

(রংপুর)

সকল প্রকার স্কুলের কলেজবই, মাদ্রাসার বই খাতা, পেন্সিল, ইউনিয়নবোর্ডের ফরম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে মওজুদ রাখি। অতি যত্নের সহিত অর্ডার সরবরাহ করিয়া থাকি।

আষাঢ়ীর শুভেচ্ছা জানায়—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোং

৩১।১, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

We make indent for :—

Empty glass, bottles, Essential oils, Chemicals

Corks, Stearic Acid & Wax all sorts

Please apply for Price list.

মজিদ পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানি প্রাইজ ও লাইব্রেরীর ভাল বই ঃ

যশস্বী কথা-শিল্পী

শামসুদ্দীন আবুল কালামের

—নব অবদান—

আশিয়ানা

সিনেমা-টেক্‌নিকে রচিত একখানি উচ্চাঙ্গের সামাজিক উপন্যাস। মূল্য—১।০

সুসাহিত্যিক

আবুয্‌ যোহা নূর আহমদ প্রণীত –

ঈদ

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাভরা সমাজ-জীবনের কয়েকখানি বাছা-বাছা মুনশীয়ানাপূর্ণ গল্পের সমষ্টি। মূল্য – ১।০

তরুণ সাহিত্যিক আলাউদ্দিন খান প্রণীত –

আবর্তন

নানা আবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে মানুষের জীবন-নাট্যের সমাপ্তি হয়। 'আবর্তনে' লেখক সেই বিষয়ই বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসখানি প্রত্যেক পাঠকের মনে যে একটা পরিতৃপ্তি দান করবেই—এটা দৃঢ়স্বরে আমরা বলতে পারি। মূল্য—২৲

কবি বন্দে আলী প্রণীত—

মনের ময়ূর

পড়তে বসে শেষ না করে আর উঠা যায় না—এমনি একটি উপন্যাস মনের ময়ূর। নিজে পড়বেন; আরও একজনকে পড়ে শুনাতে ইচ্ছা হবে। মূল্য—২।০

স্বনামধন্য কবি

বন্দে আলী মিয়ার অবদান

শাহনামার গল্প

কবি ফেরদৌসীর বিখ্যাত 'শাহনামা' গ্রন্থের গল্পগুলি খ্যাতনামা গল্প-লেখক ও কবি বন্দে আলী সাহেব কিশোরদের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করেছেন। পড়তে বসলে শেষ না করে উঠতে পারা যাবে না—পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আকর্ষণ। মূল্য—১৸০

তরুণ কথা-শিল্পী মোস্‌লেহউদ্দীন প্রণীত

রসাত্মক কৌতুক-নাটিকা

সিনেমা বিভ্রাট

সিনেমা-জগতের অনেকগুলি গূঢ়-রহস্য কথা-শিল্পী মোস্‌লেহউদ্দীন সাহেব বেশ রসাল এবং হৃদয়গ্রাহী ক'রে এই নাটিকার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন। নাটিকাখানি হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে বহু গোপন তথ্যের সন্ধান প্রকাশ ক'রে ফেলেছে।

মূল্য—৸০।

মরমী কথা-শিল্পী

কাজী আবুল হোসেন প্রণীত—

শেষ নবী

যাঁর নাম করলে অন্তর পবিত্র হয়, দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হ'য়ে যায়। সেই শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনধারা অতি সহজ, সরল এবং সুললিত ভাষায় রচিত। মূল্য—২৲

কিশোর-পাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার—

মেরু-রহস্য

রহস্যপূর্ণ মেরু-প্রদেশের একটি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী কথা-শিল্পী কাজী আবুল হোসেন সাহেব কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী ক'রে রচনা করেছেন। বইখানি হাতে পড়লে শেষ না ক'রে উঠবার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। মূল্য—১৷৷০

প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক

আঃ কাঃ শাঃ নূর মুহম্মদ প্রণীত—

আস্‌ছে বছর

সাজ্জাদ এদেশেরই একজন আশাবাদী কিশোর। আমাদের পেছিয়ে-পড়া সমাজকে গ'ড়ে তোলার জন্য কিভাবে উতলা হ'য়ে কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—'আস্‌ছে বছরে' তার নিখুঁত ছবি আঁকা হয়েছে। মূল্য—১৷৷০

রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—

সুলেখিকা নামতা আনোয়ার প্রণীত—

ডাঃ শামীমের আবিষ্কার

রক্ত-পিপাসু খুনে-দস্যু আলী খানের জিয়ানো মগজের দেহ নেই, হাত নেই, পা নেই। তবু সেই মগজ বীভৎস নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিল কেমন করে? বিংশ শতাব্দীর কায়াহীন ফ্রাঙ্কিনষ্টিনের হৃদয়বিদারক কার্যকলাপ—মৃত্যুর চেয়েও ভীতিপ্রদ—ভয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনায় পূর্ণ। বইখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা। মূল্য—১০

সুসাহিত্যিক কাজি আফসারউদ্দিন আহ্‌মদ প্রণীত—

তিন শয়তানের ষড়যন্ত্র

নাসিরউদ্দীন সিদ্দিকী লোহার কারবারী লক্ষপতি চিরকুমার বাল্যবন্ধু আহ্‌মদকে তাঁর সর্বস্ব করলেন দান। কিন্তু বাদ সাধল তাঁর বয়াটে ভাই-পো। রহস্যের পর রহস্য ঘটনার পর ঘটনায় বইখানিপূর্ণ। মূল্য—১০ আনা।

চক্রান্তের বেড়াজাল

কাজি আফসারলদ্দীন সাহেবের রচিত আর একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। 'চক্রান্তের বেড়াজাল' পাঠকমাত্রকেই ঘটনাগুলির ওপর চিন্তান্বিত ক'রে তোলে। বইখানি শেষ না ক'রে পাঠকের মনে সোয়াস্তি আসে না।

মূল্য—১০

সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন প্রণীত

বেহেশ্‌ত্‌ নসীব

স্ত্রী ভূমিকা-বর্জিত কিশোরদের অভিনয় উপযোগী কৌতুক-নাটিকা। ধনের চেয়ে যে বুদ্ধির বল বেশী তা এই নাটিকার ছোট সর্দার আর বড় সর্দারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা হইয়াছে। নাটিকাখানিতে যেমন হাসির খোরাক আছে, তেমনি শিক্ষার বিষয়-বস্তুও যথেষ্ট আছে। মূল্য—৸০

ছোটদের আবৃত্তি

ছেলেমেয়েদের আবৃত্তির উপযোগী বিভিন্ন নামকরা কবিদের রচিত আবৃত্তিমূলক কবিতা-গুলি সুসাহিত্যিক সালাহউদ্দীন সাহেবের দ্বারা সঙ্কলিত হয়েছে। বাজারে এ-ধরণের বই আর বার হয়েছে কিনা সন্দেহ। মূল্য—১৲

স্বনামধন্য কথা-শিল্পী

মেহরাব আলী চৌধুরী প্রণীত—

চাঁদের দেশে অভিযান

কিশোর-কিশোরীদের মনোরম গল্পগুচ্ছ।

মূল্য—২৲

ঈমানের জোর

মেহরাব আলী সাহেবের রচিত কিশোর-কিশোরীদের খুশী করার মত আর একখানি গল্প-গুচ্ছ। মূল্য—১৲

কঙ্কাল

মেহরাব আলী সাহেব রচিত কিশোর-কিশোরীদের প্রাণ-মাতান একখানি অপূর্ব উপন্যাস। মূল্য—১৷৷০

=বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ রচয়িতা=

রেয়ায উদ্দিন আহ্‌মদ প্রণীত—

রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস সিরিজ

১।	দস্যু রাণী	১৲
২।	দস্যু রাণী ও মিঃ সামাদ	১৲
৩।	দস্যু রাণীর প্রেমাভিনয়	১৸০
৪।	কাশ্মীর অভিযানে দস্যুরাণী	২৲
৫।	দস্যু রাণী ও গুপ্তচর	২৲
৬।	দস্যুরাণীর বিজয় অভিযান	২৲

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মজিদ পাবলিশিং হাউস

১৪।১৫, পাটুয়াটুলী, ঢাকা ঃ

জিন্দাবাজার, সিলেট ঃ জিন্নাহ্‌ এভিনিউ, ফরিদপুর ঃ

পাক্‌-পাহাড়পুরের খবর

দুনিয়ার সেরা দৌলত স্বাস্থ্য

পাক পাহাড়পুর ঔষধালয়
দিনাজপুর

পাক-পাহাড়পুর ঔষধালয় পাকিস্তানের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ মুসলিম আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি জন সেবায় নিয়োজিত আছে। এখানে শাস্ত্রীয় মতে বিশুদ্ধ উপাদানাদি দ্বারা প্রস্তুত সব প্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ, যেমন— আসবারিষ্ট, তৈল, ঘৃত, চব্যনপ্রাশ, মকরধ্বজ, স্বর্ণ জারিত প্রভৃতি যাবতীয় ঔষধ প্রচুর পরিমাণে সর্বদা বিক্রয়ার্থে মজুদ থাকে।

রোগ বিবরণ যথাযথ ভাবে লিখিয়া পাঠাইলে পাক্‌-পাহাড়পুর ঔষধালয়ের প্রধান কবিরাজ ব্যবস্থাপক বোর্ড হইতে রোগ বিবরণ বিচার করিয়া যত্নের সহিত ব্যবস্থা-পত্র দিয়া থাকেন। তজ্জন্য কোনরূপ ফি দিতে হয় না।

পরিচালক—

রাজমুহম্মদ সরকার

N. B. সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্ট ও পাইকারগণকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে এজেন্সীর নিয়মাবলী পাঠান হয়।

হুতাশন

অজীর্ণ ও অম্লরোগের ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে ক্ষুধা-মান্দ্য দূর করিয়া নিয়মিত ভাবে লিভারের কাজ করে এবং পেট বেদনা, অম্ল-ক্ষত (ডিউডিনাম ও গ্যাসটিক আলসার) দূর করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল করে। একবার ভাল হইয়া গেলে জীবনে কোনদিন আর এই জটিল ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। পেটের ক্ষত-রোগে ঐরূপ মহৌষধ আর নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৪৲ টাকা।

বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় ২।১ বার মালিশে সর্বপ্রকার দাদ, কাউর জল-হাজা ও পাকুই প্রভৃতি যাদুর ন্যায় আরোগ্য হয়। শরীরে কোনরূপ দাগ বা চিহ্ন থাকে না।

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি, মূল্য প্রতি কৌটা ॥০ আনা। ডজন ৪৲ টাকা।

অর্শহা

ইহা ব্যবহারে অন্তর্বলী, বহির্বলী অন্তর্বলী, স্রাবী, অস্রাবী সর্বপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক, নূতন ও পুরাতন অর্শ ৭ দিনে নির্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। আরোগ্যের পরেও কিছুদিন ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ৩॥০ আনা।

ক্রিমলীন

ইহা ব্যবহারে ক্রিমির যাবতীয় উপদ্রব যথা—পেট ফাঁপা, বমন, বেদনা, দাস্ত, আহারে অনিচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ বিশেষ ভাবে দূরীভূত হয় এবং পেটের যাবতীয় প্রকারের ক্রিমি মরিয়া বাহির হইয়া যায়। মূল্য ১।০ আনা।

পাহাড়পুরের মহোপকারী সুবাসিত

রাজ কুসুম তৈল

আধুনিক সুমধুর সৌরভে আয়ুর্বেদোক্ত মতে অলৌকিক গুণ সম্পন্ন বিবিধ ভেষজ দ্বারা বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত। এই তৈল নিয়ত ব্যবহারে মানসিক শ্রমের অবসাদ দূর করিয়া মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা, মনের ফূর্তি, কর্মের উৎসাহ, চিন্তাশক্তি প্রদান করিয়া কেশের সৌন্দর্য চিরস্থায়ী করেন।

মূল্য—ছোট শিশি ১।০ বড় শিশি ২৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

পাক-পাহাড়পুর ঔষধালয় দিনাজপুর (পূর্ব-পাকিস্তান)

রক্তদুষ্টি হইতে উৎপন্ন সর্ব প্রকার রোগে

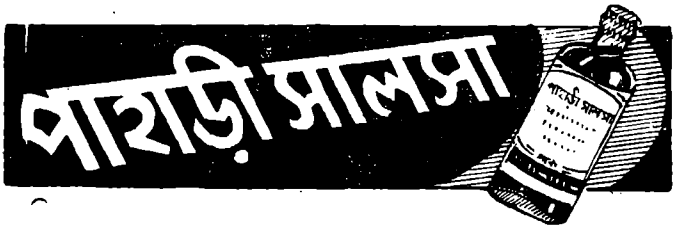

দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া শরীর দুর্বল ও রক্তহীন হইলে পাহাড়ী সালসাই মানবের হারান স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে। মূল্য ৮ আঃ শিশি—২৷৷০

বহুমূত্র রোগের অবর্থ ফলপ্রদ ঔষধ

হৃদ রোগের নির্ভরযোগ্য ঔষধ। ইহা ব্যবহারে হৃদয়ে সূচি বিদ্ধবৎ বেদনা, শ্বাসকষ্ট, অন্ধকার দেখা, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, সামান্য উত্তেজনাতেই কম্প ও বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি দূরীভূত হয়। মূল্য ৫৲ টাকা।

ইহা সর্বপ্রকার জ্বরের আমোঘ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে ম্যালেরিয়া জ্বর, পালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, জীর্ণজ্বর, কুইনাইন সেবনজনিত পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য—২৲ টাকা

(পাক-পাহাড়পুর ঔষধালয়, দিনাজপুর পূর্ব-পাকিস্তান)

বাতশান্তি তৈল

সর্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন বাত ব্যাধি, পক্ষাঘাত, হৃৎকম্পন, শিরকম্পন, বধিরতা এবং সর্বপ্রকার কোমরের বাত, ঝিঝিবাত, গেটেবাত, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যে বাত বৃদ্ধি পায় ও কুপিত বায়ু প্রভৃতির অব্যর্থ ফল প্রদ মহৌষধ। এই ঔষধ ব্যবহারে দীর্ঘদিনের বাতব্যাধি অতি সত্বর আরোগ্য হইয়া শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আনে।

মূল্য বড় শিশি (৵০ আধ পোয়া) ৫৲ টাকা ও ছোট শিশি (⁄০ ছটাক) ৩৲ টাকা।

এজমল

হাঁপানী রোগে ও যে কোন শ্বাস কাশের কষ্টে ইহা নস্যের ন্যায় ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার যন্ত্রণা দূর করে এবং স্থায়ীভাবে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ডায়বেটিনা

বহুমূত্র রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে শারীরিক দুর্বলতা, মস্তিষ্কের শিথিলতা, প্রবল পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, মূত্রাধিক্য, সুগার পড়া ইত্যাদি উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে। মূল্য প্রতি কৌটা ৫৲ টাকা।

সুষমা

ইহা মালিশে দুষ্টব্রণ, বয়স ফোড়া, মেছেতা ও মুখে বিভিন্ন প্রকারের দাগ প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া মুখশ্রী লাবণ্যযুক্ত করে।

নয়নমনি

চক্ষুরোগে ধন্বন্তরী

ইহা ব্যবহারে চোখ উঠা, চোখ লাল হওয়া, জল পড়া, পিচুটী পড়া, ঝাপসা দেখা, চোখ কং কং করা, রাত কানা ইত্যাদি যাবতীয় চক্ষুরোগ অতি সত্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল ৸০ আনা।

নিয়মাবলী

- প্রতি বাংলা মাসের ২য় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বৎসরের যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।
- রচনা সম্পাদকের নিকট এবং টাকা ম্যানেজারের কাছে পাঠাতে হয়।
- রচনা কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার ক'রে লিখে পাঠাতে হয়। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।
- কোন মাসের কপি না পেলে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদেরকে জানাতে হবে।
- গ্রাহকগণ ঠিকানা বদল করলে যথা-সময়ে ম্যানেজারকে সে সংবাদ জানিয়ে দিতে হবে।
- ধাঁধার উত্তর প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখের মধ্যে পাঠাতে হয়।
- পত্রিকার মোড়কে গ্রাহকের নাম-ঠিকানার পাশে গ্রাহক-নম্বর দেওয়া হয়। আমাদের কাছে লিখিত প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহকদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার— নতুবা কোন বিষয়ে খোঁজ-খবর বা ঠিকানা বদলানো সম্ভব নয়।
- বার্ষিক সডাক মূল্য—৫৲, ষান্মাসিক—৩৲, প্রতি সংখ্যার দাম—।৶০ আনা। নমুনা সংখ্যার জন্য ।৶০ আনার ডাক-টিকিট পাঠাতে হয়। ভারতের কোন স্থান হতে কেউ গ্রাহক হতে চাইলে, পত্রালাপ করতে হয়।
- ১০ কপির কম কাকেও এজেন্সী দেওয়া হয় না।
- এজেন্সীর জন্য পত্রিকা ভি-পিতে নিতে গেলে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয়। এজেন্টদের শতকরা ২৫৲ কমিশন দেওয়া হয়।
- বিজ্ঞাপনের হারের জন্য ম্যানেজারের সঙ্গে পত্রালাপ করতে হয়।

ম্যানেজার: "আলাপনী"
২১নং রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
ফোন: ২৭৯৭

এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন.....

অধ্যাপক মিন্নাত আলী

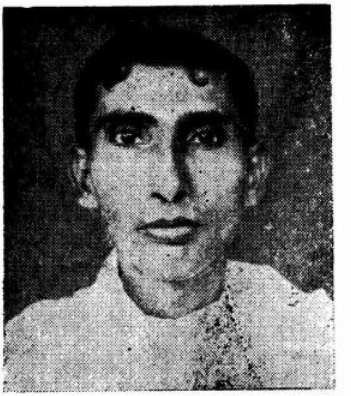

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

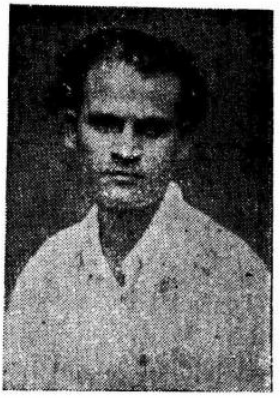

আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ

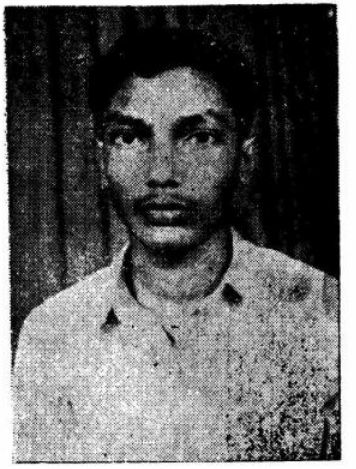

আবু হেনা

মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্

মুহম্মদ সুলতান

মোজাফ্ফর
হোসেন

জলি রহমান

ব'নজীর আহমদ

প্রবাল

নাসিরুদ্দীন আহমদ

পি. সি. সরকার

এম, এ. হাশেম খান

আবদুল খালেক জোয়ার দার

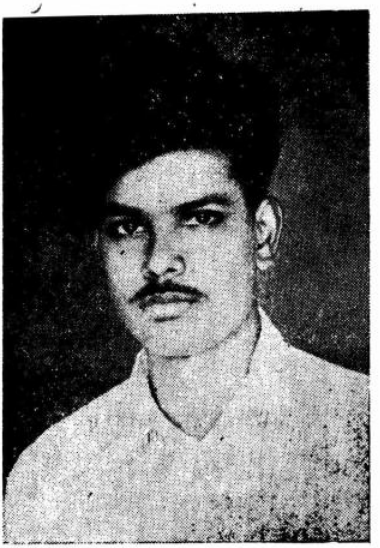

বদি-উজ-জামান

আবুল হাসান

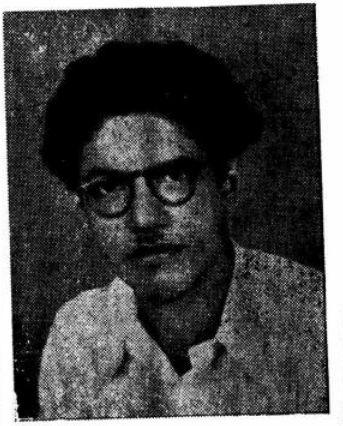

এ, বাসির

সাহেদ লতিফ

কাজী গোলাম আহ্‌মদ

আলাপনী

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬৪ | আষাদী সংখ্যা (একাদশ)

উন্নত থাক পতাকা মোদের

॥ সাহেদ লতিফ ॥

১৪ই আগস্ট।

ওই যে নীল আকাশের গায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে পতাকা, শ্বেত আর সবুজের পটভূমিতে অর্ধচন্দ্র-তারকাখচিত ওই যে কওমী নিশান ভোরের সোনা সোনা আলোয় হাস্‌ছে আর দোল খাচ্ছে—ওর দিকে তাকিয়ে বুকভরে শ্বাস নেয়

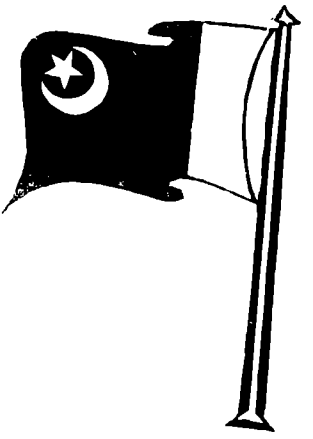

হাজারো মানুষ, কোঁচকানো চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে ওঠে এক ঝলক আনন্দের আভা, শুক্‌নো ঠোঁট দু'টোও কি যেন বল্‌তে চেয়ে কেঁপে ওঠে বার বার।

নতুন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আমাদের পরিচয় এখনও শুধু এই "হাঁটি হাঁটি পা পা"। ব্যক্তি-জীবনে যেমন আমরা বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রামে রত, তেমনি জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধানেও আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেক আশাভঙ্গের বেদনা আর ব্যর্থতার চোরা-বালিতে পা আট্‌কে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বরণ করে নিয়েও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, ইতিহাসের পাতায় যেন আমরা ক্লীব নামে অভিশপ্ত না হই।

তাই আষাদীর এই একাদশ বৎসরের যাত্রাশুরুতে ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে থাকি ওই সবুজ পতাকার দিকে। আমাদের স্বাধীনতা আর সাধনার, আশা আর আকাঙ্ক্ষার, গৌরব

আর সম্ভ্রমের প্রতীক ওই পতাকা ; মাথা নেড়ে নেড়ে কর্মের পথে আহ্বান জানায় ওই পতাকা, কখনও-বা ডাক দেয় রক্তের দামে দেশ মাতৃকার সেবায়—ওই আমার পতাকা—এস, আষাঢ়ীর এই পুণ্য প্রভাতে আমরা অভিবাদন করি তাকে।

আমার সোনার ভাই বোন! আজকের দিনে একবার স্মরণ কর ওই পতাকার ঐতিহ্য। যে গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী তোমরা, আর ওই সবুজ নিশান যার প্রতীক তাকে মজবুত হাতে পরিপূর্ণতার পথে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমাদের।

অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার কথা। আরব দেশের নিরক্ষর নবীর সত্যের বাণী তখন প্রভাত সূর্যের স্নিগ্ধ আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছে দেশ হতে দেশান্তরে। এমনি এক দিনে দেখা গেল আরব দরিয়ার ঢেউএর মাথায় মাথায় পা দিয়ে এক তরুণ মুসলমান যুবক মাত্র কয়েকজন সৈন্য সাথে এসে নামলেন হিন্দু রাজার দেশ সিন্ধুতে। পদানত হ'ল সিন্ধু, জয় করা হ'ল মুলতান, উড়ানো হ'ল হেলালী ঝাণ্ডা। সেই প্রথম হেলালী ঝাণ্ডা যিনি ভারতবর্ষের বুকে উড্ডীন করেছিলেন তাঁর নাম ছিল মহম্মদ ইবনে কাসিম। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল এদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা।

এরপর খাইবার গিরিপথের পাথুরে পথে ঘোড়ায় খুরে আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে এল তুর্কী, এল পাঠান, এল মোগল। ১৫২৬ সাল। প্রথম পানিপথের যুদ্ধের বিজয়ী বীর যুবরাজ বাবুর সূচনা করলেন মোগলের ইতিহাস। ধীরে ধীরে আসমুদ্রহিমাচল মোগলের পদভরে কম্পিত হ'ল, বিজয়-গর্বে উড়্‌ল হেলালী নিশান।

তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এল আর এক অধ্যায়। রেনেসাঁ পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জাতিগুলো ডানপিটে ছেলের মত বেরিয়েছিল ঘরছাড়া হয়ে। ষষ্ঠদশের শেষ ভাগ, সপ্তদশ আর অষ্টাদশের প্রথমে ভারতবর্ষের ঘাটে ঘাটে বিদেশী বণিকরা করল হানাহানি—ওলন্দাজ, ফরাসী আর ইংরেজ। চতুর ইংরেজের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে না পেরে সরে পড়্‌ল ফরাসী আর ওলন্দাজ। কিন্তু বণিক ইংরেজ এদেশে বস্‌ল গেড়ে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর শুধু সিরাজের স্বাধীনতার পতাকাই অবনমিত হয়নি, বরং সেদিন থেকেই ভারতবর্ষ শৃঙ্খলিত হয়েছিল পুরোপুরি।

বিশ্বাসঘাতকতা আর বিচ্ছিন্নতার চরম অভিশাপ হয়ে যখন পরাধীনতার দণ্ড নেমে এল জাতির জীবনে, ঠিক তখন থেকেই শুরু হল আবার স্বাধীনতার সংগ্রাম, ধূল্যবলুণ্ঠিত পতাকাকে উন্নত করার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের ধারায় দেখেছি উদয়নালা আর বক্সারের যুদ্ধক্ষেত্রে মীর কাসিমকে, দেখেছি শ্রীরঙ্গপত্তমে রক্তাক্ত শহীদ টিপুসুলতানকে, দেখেছি হায়দর আলীকে। তারপর ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লবে সিপাহীরা যে নতুন করে রক্তবীজ বুন্‌লো এদেশের মাটিতে তারই পরবর্তী বহিঃপ্রকাশ দেখেছি তীতুমীর আর

ক্ষুদিরাম, অনন্ত সিং আর মাষ্টার দা, এমনি আরও কত নাম-না-জানা বীর।

দেশে তখন পাশাপাশি শুরু হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। নির্যাতিত এদেশের মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গানোর ডাক দিলেন ইক্‌বাল, পাশে এসে দাঁড়ালেন আরও অনেকের সঙ্গে স্যার সৈয়দ আহমদ আর আলী ভাইরা। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস-ভূমি পাকিস্তানের দাবী তখনও দানা বাঁধেনি।

বহু রাজনৈতিক বিবর্তনের মুখে একটি সত্য সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল—হিন্দু আর মুসলমান দু'টো আলাদা জাতি—স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের জন্য দু'টো পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল গোটা মুসলমান সমাজ; পাকিস্তান দাবী করে ১৯৪০ সালে পাশ হ'ল বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব।

বৃটিশ আর হিন্দু কংগ্রেসের যৌথ প্রতি-বন্ধকতার মুখে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে ধূল্যবলুণ্ঠিত স্বাধী-নতার পতাকা আবার উড়েছে ওই শীর্ষদেশে। আমাদের গৌরবময় মহান ঐতিহ্যের ঐ হেলালী পতাকা আজও উড়ছে—আজ আমাদের শপথ নেবার দিন—যতদিন আমরা একজন পাকিস্তানীও জীবিত থাকবো ততদিন ঐ পতাকা এমনিভাবেই উড়বে।

আষাদীর দিন

॥ আঃ কাঃ শঃ নুর মোহাম্মদ ॥

●

আজ আষাদীর দিন মহান ঃ
দিকে দিকে জাগে পুলক-বান,
দেখিছে নয়নে উদার-প্রাণ,
নতুন দিনের স্বপ্ন-সাধ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

চল আগে চল, হে দুর্জয় !
আর এখানে নাহিক ভয়,
নাম তোমাদের বিশ্বময়
আজ তোমরা পুরো আষাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

বীর-সেনানী সাজ্‌রে সাজ,
জোরসে কর কুচকাওয়াজ,
করতে সকল দেশের কাজ
ভাঙরে এবার লক্ষ বাঁধ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

নাশ্‌তে কলুষ অত্যাচার
তোমরা তরুণ দুর্নিবার
আনহ শান্তি দেশে আবার
দিকে দিকে দাও সুসংবাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

পাকিস্তানের নও জোয়ান,
দেখে তোমাদের মুর্দা-প্রাণ
আনিল যাহারা পাকিস্তান
আজ করে তারা আর্তনাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

আবার এসেছে আষাদী দিন,
আর হ'য়োনা লোভে মলিন,
ছেড়ে দাও আজ স্বার্থ হীন
দূর কর সব যত ফ্যাসাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

তৌহিদী-বাণী লয়ে বুকে
হায়দারী হাঁক আনি মুখে
বীর-মুজাহিদ মহাসুখে
নূতন ফসল কর আবাদ।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

জনযুদ্ধ !

মুহম্মদ সামসুল্লাহ্

যুদ্ধ নিশ্চয়ই বোঝ ?

কিন্তু জনযুদ্ধ কি, বোঝান মুশকিল। আগে যুদ্ধের কথাই বলি। যুদ্ধ আজকে কিছু আর নতুন নয়। মানুষ গুহা ছেড়ে সমাজ জীবন আরম্ভ করার সাথে সাথে বিবাদ লাগল। দল বাঁধল। দলে দলে যুদ্ধ হ'ল। এক দলের হার হ'ল আর দল জিতল। যারা জিতল তারা যারা হারল তাদের মনিব হ'ল—অন্যরা হ'ল দাস।

দলের দলপতি ক্রমে ক্রমে সমাজের শাসন ব্যবস্থায় নৃপতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল। তারপর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাঁগড়ার প্রাণ যায়। এদলের সাথে ওদলের বিবাদ থাকুক না থাকুক রাজায় রাজায় বিবাদ, মন কশাকশি আর রেশারেশি হ'তে হ'তে পরিণাম হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধ। যুদ্ধটা শাসকের মরজি মাফিকই হয় সব সময়।

রণদামামা বাজল রাজপ্রাসাদের তোরণে। সাজ সাজ রব। হৈ হুল্লোড় রবে সরগরম হয়ে উঠল যেন দেশটা। ঢাল, সড়কি, বল্লম, তলোয়ার, গদা, খঞ্জর আর হাতিয়ার ব্যবহার যে যে জানে সেত যুদ্ধে যেতে বাধ্যই, এমন কি যে একটু হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গাট্টা জোয়ান তাকেও যেতে হবে যুদ্ধে। কামান টেনে নেওয়ার কাজে বা কোন না কোন কাজে তাকেত লাগান যেতে পারে। রাজার সৈন্য-সামন্ত, বরকন্দাজ আর গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, নফর, চাকর, কে বা-এস্তেহা দরকার যুদ্ধে।

ক্রমে ক্রমে এল যুদ্ধ রাজা কংসের যুগ ছেড়ে দিগবিজয়ী আলেকজান্দারের যুগে। দেশের পর দেশ জয় করে চল্‌ল এক দেশের রাজা অন্য দেশে। অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষের কথা—আমার বশ্যতা স্বীকার ত করবেই—আমার ঘোড়া আটকালেও মরবে—তোমাকে দেখে নেব এই হুমকি।

মানুষের সভ্যতা ধাপে ধাপে এগিয়েছে আর যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে এক দেশের রাজা আর এক দেশ জয় করে মহারাজ বা সম্রাট হয়ে নিজের জয়-ধ্বনি শুনেছেন বিজিত দেশে নিজের কানে।

যুদ্ধের আহাজারী শুধু সৈনিকের নয়—মাএর, বোনের, ভাইএর, বাপের, ছেলের, মেয়ের, বৌয়ের—দরদী আর মমতা মাখা প্রাণের

এতে কিন্তু কান নেই রাজার, মহারাজার বা সম্রাটের।

সভ্যতার উন্নতি ও জ্ঞানের বিকাশ হাতে হাত মিলিয়ে শুধু মানুষের ভরণ, পোষণ, চিকিৎসা এসবকেই এগিয়ে নিয়ে গেল না, যুদ্ধবাজ রাজা আর সৈনিক নয়—সাধারণ ব্যবসায়ী, শিল্পী, শ্রমজীবী, কারিগরী ব্যুৎপত্তি যার আছে এবং বৈজ্ঞানিকরাও গবেষণা করে করে যে সব জিনিসপত্র আবিষ্কার করল তৈরী করল কাজের সুবিধার জন্য—যুদ্ধে গিয়ে সেও সহায়তা করল।

নৌকো থেকে জাহাজ হল পাল খাটিয়ে। তারপর, সে জাহাজের উন্নতি হচ্ছে সর্বতোভাবে। যুদ্ধের জন্য আধুনিক জাহাজ যেমন আছে যাত্রীবাহী জাহাজও আছে তেমনি। কামান বন্দুক এগুলোরও আধুনিক যে রূপ তাও এসেছে ধাপে ধাপে। উড়োজাহাজ মানুষের দূরপাল্লা সফরকে নিকটতম করেছে সব ভাবেই। যুদ্ধের কাজ আজ হাওয়াই জাহাজ ছাড়া হওয়াই অসম্ভব। তীর ধনুক বল্লম ঢাল এসব একদিন যুদ্ধের কাজে যত প্রয়োজনীয় হউক আধুনিক কালে সেগুলো যাদুঘরের বিশেষ দ্রব্যই শুধু। এটম বোমা যুদ্ধেও লাগে আবার শান্তির কাজেও লাগছে।

যাক্, যা বলছিলাম তাই বলি।

যুদ্ধ প্রায়ই হয়েছে ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ রাজা বাদশাহ সম্রাটের খেয়াল খুশী—রাজ্য জয়ের নেশায় বা পরবর্তীকালে উজির, আমীর ওমরাহদের এবং মন্ত্রীর পরামর্শে। আলেকজান্দার, দারিয়ুস, অশোক থেকে আরম্ভ করে চেঙ্গিস, তৈমুর, আকবর, পৃথিবীর প্রথম মহা-সমরের ইতিহাস ব্যক্তি বিশেষের মরজিতে যুদ্ধের ইতিহাস।

পুরাকালে ভারতের কংস, পরবর্তীকালে জার্মানীর কাইসার বা জাতীয় গৌরব মর্যাদার জন্যে আলেকজান্দার বা আর যে কেউই যুদ্ধ করে থাকুক সে যুদ্ধে দেশের জনসাধারণ মনের খুশীতে যোগ দেয়নি কোন কালে।

মানুষের ইতিহাসে কয়েকটা যুদ্ধের নজীর পাওয়া যায় যেটাতে যুদ্ধবাজ শাসকের পাশে দেখা যায় জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় লড়তে জীবন পণ করে। এ যুদ্ধগুলো ধর্মযুদ্ধের রূপ নিয়েছে ইতিহাসে। ইসলামের ইতিহাসে এমন ধারা জেহাদ আছে বহু।

পৃথিবীর ইতিহাসে নীতি নিয়ে রাজা আর তার প্রজা দেশের সবাই যুদ্ধ করতে না যাক সকলের সহানুভূতি নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে কমই। ধনী, গরীব, জমিদার, প্রজা, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই যে যুদ্ধ নিয়ে যে দেশে মাথা ঘামায় জেতার স্বপ্ন নিয়ে—সে যুদ্ধ তখন হয়ে দাঁড়ায় জনযুদ্ধ।

আধুনিক যুগের ইতিহাসবিখ্যাত এ'রকম জনযুদ্ধ হয়েছিল আমেরিকায়। ১৭৭৬ সালে ইংল্যাণ্ডের আমেরিকা শাসনের অবসান ঘটল।

নিজের দেশের লোকজনেরা যারা সুদূর আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে ইংল্যাণ্ডের পতাকা তুলেছিল সগৌরবে তারাই নামিয়ে দিল সে পতাকা—উড়িয়ে দিল স্বাধীনতার এক নতুন পতাকা। ঘটনাটা ঘটে ৪ঠা জুলাই ১৭৭৬ সালে এবং তারপর পৃথিবীতে হ'ল এক নতুন যুগের সূচনা।

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসী দেশের সৈন্য এবং নাগরিকেরা বাস্তিলের কারাগার দখল করে মুক্ত করে দিল নির্যাতিত বন্দীদের। তারপর চল্‌ল পাঁচ বছর ফরাসী দেশে জনগণের মহান যুদ্ধ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশের উৎপীড়ক যালেম বাদশাহ আর তার যুলুমশাহী শাসনের বিরুদ্ধে। দু'বছর ছলে বলে কৌশলে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর রাজা লুই দেশ ছেড়ে পালালেন। রাজা লুইএর মুণ্ডচ্ছেদ হল বটে কিন্তু পরে জনগণের সেনাবাহিনীর এক তরুণ সেনানায়ক—নেপোলিয়ন বোনাপার্টি জনসাধারণের স্বপ্ন ও আশাকে পদদলিত করে নিজে হয়ে বসল ফরাসী-সম্রাট। তারও স্বপ্ন ভেঙে গেল। জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল নেপোলিয়নকে। মরতে হয়েছিল বন্দীশালায় সুদূর দ্বীপান্তরে।

এরপর সারা ইউরোপব্যাপী এক নতুন আলোর ঝলকানিতে জনসাধারণের মধ্যে নতুন সাড়া পড়ে গেল। নতুন মতের সৃষ্টি হ'ল। মানুষকে নিয়ে মানুষ ভাবতে লাগল। রাজা শাসন করেন প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং রাজকূল পূর্বে যে ভাবত তাদের জন্মগত অধিকার শাসনের—যেন বেহেশতী সনদ আছে—তা ইংল্যাণ্ডের চার্লস আর ফরাসী দেশের লুইএর মুণ্ডুপাত হওয়ার পর সে মত পাল্‌টে গেল এবং পরবর্তীকালে জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সুনাম আর ক্ষমতা আরাম আর আয়েশে চলেছে যে সব শাসক তাদেরকেও নেপোলিয়নের মত ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে। ইসলাম যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিল ইউরোপে তারই প্রতিক্রিয়া হ'তে লাগল ইউরোপবাসীর মনে। জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

এই নতুন স্বপ্নে গেল পরাক্রান্ত রুশিয়ার জার, গেল জার্মানীর কাইসার, গেল তুরস্ক, চীন প্রভৃতি পুরাতন সাম্রাজ্যের সম্রাট। গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতে লাগল জনগণ এবং বাইরের শত্রুর হামলা বা ঘরের দুশমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং যুদ্ধ করল মরণপণ করে। এটাও জনযুদ্ধের এক নতুন অধ্যায়।

আমাদের পাক-ভারতে এ'রকম জনযুদ্ধের একটা নজীর আছে। সেটা হচ্ছে ১৮৫৭ সালের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ। জাতিধর্মনির্বিশেষে দিল্লীর বাদশাহ এবং সেনানী, প্রজা

ও জমিদার আর অন্যান্যরা সবাই ভাবতে লাগল একই ভাবনা। একই যুদ্ধের আয়োজন, একই স্বপ্ন—দেশকে আযাদ করতে হবে কৌশলী ইংরেজের ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত ও নির্লজ্জ শোষণ আর ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে—সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে। নানান কারণে হেরে গিয়ে দেশের উপর নেমে এসেছিল যে সুদূর ইংল্যাণ্ডের মহারাণীর শাসন আর শোষণের অভিশাপ—তার বিরুদ্ধেও লড়াই চলল এরপর যেন শতবর্ষের খণ্ড যুদ্ধ। এই যুদ্ধও ছিল জনযুদ্ধ; গণভিত্তিক লড়াইর পরিসমাপ্তি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রজাতন্ত্রের স্থাপনে।

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট থেকে বছরের পর বছর জাতির জীবনে তাই আসে আযাদী উৎসব—জনযুদ্ধের জয়ের বিজয় উল্লাস আর ভবিষ্যতের জনযুদ্ধের প্রতিজ্ঞা নেওয়ার মহড়াও বটে। যেদিন প্রয়োজন হবে সে সময় করবে লড়াই। সেদিন আবালবৃদ্ধবনিতা নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা পদদলিত বা অবহেলিত হ'লে ঘরের শত্রু বা বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে এই তার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে সৈন্যের পাশে। নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে এই জনযুদ্ধের ভেতর দিয়ে।

আমাদের প্রতিবেশী মহান সোভিয়েট রুশ ও চীনের জনগণের ইতিহাসে আধুনিক জনযুদ্ধের নতুন রূপ আমরা দেখেছি যখন নাৎসি আর ফ্যাসীস্ট আক্রমণে ওদের দেশ আক্রান্ত হয়েছিল। খোদা না করেন, আমাদের লড়তে হয় তেমন কোন জনযুদ্ধ। শান্তির ধর্ম ইসলাম—শেষ পর্যন্ত শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করেই পরে ধরতে হবে হাতিয়ার।

মাতা-সায়র

॥ কাদের নওয়াজ ॥

এ পথ দিয়ে গেলে পথিক !
ভুল ক'রনা হেথায় আসা,
মাতা-সায়র দেবেই তোমায়
মায়ের মতই ভালবাসা ।
স্বচ্ছ সলিল, সান্দ্র মধুর,
সুন্দর তীর শষ্পে ঢাকা ।
সকাল-সাঁঝে বেতস্-বনে,
ভালই লাগে ডাহুক-ডাকা ।
ঘাটের কাছেই ওই যে তরু,
জলটি যেথায় আছেই ছুঁয়ে ।
সুরভিত সেথায় বাতাস,
কুন্দফুল আর বনা জুঁয়ে ।
অনেক বছর আগের কথাই,
গল্প সম হয় যে মনেই ।
চ'লেছিলেন এ পথ দিয়েই
জননী তাঁর পুত্র সনেই ।
ছিলনা যে তখন পুকুর,
ঠাঁই যে ছিল মরুর মতন ।
সন্ধ্যা-বেলায় ডাকত হেথায়,
'হায়না' 'চিতা' তীক্ষ্ণ-দশন ।
এ পথ দিয়ে কেউ যেতনা,
দিন হ'ত তপ্ত বেজায় ।

সে পথ দিয়েই গেলেন মাতা,
সংগে শিশু-পুত্রটি হায়।
প্রচণ্ড রোদ্, তৃষায় শিশুর
বুঝিবা আজ ছাতিই ফাটে।
মিলেনা জল কোথাও খুজেই,
সারা দুপুর বৃথাই কাটে।
সাঙ্গ হ'ল শিশুর জীবন,
মৃত তনয় ল'য়েই ক্রোড়ে।
কাঁদেন মাতা, অশ্রু-অঝোর,
শ্রাবণ ধারায় পড়েই ঝ'রে।
ধ্যান-ধারণায় কাট্‌ল দিবস,
গোঁয়ায় নিশি, ডুব্‌ল শশী।
মৃত-শিশু ব'ক্ষে ধ'রেই,
তবু মাতা রয় যে বসি।
প্রভাত হ'ল উঠ্‌ল রবি,
উড়্‌ল নভে বকের সারি।
মাতা হ'ল স্নিগ্ধ সায়র,
ল'য়ে বিমল স্বচ্ছ বারি।
পুত্র তাহার, কুমুদ-কোরক,
হ'য়েই বুকে রইল ফুটে।
পিয়ায় মাতা তারেই সলিল,
জিয়ায় রাখিল বক্ষ পুটে।
মাতা-সায়র সেই হ'তে নাম,
নয়ন জুড়ায় স্বচ্ছ নীরেই
দেয় সে স্নেহ, দেয় সে দরদ,
আসলে পথিক তাহার তীরেই।

—০—

আলেফ লায়লার গল্প

॥ অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন্ ॥

তোমরা হয়ত কেউ কেউ পুঁথি-সাহিত্যের নাম শুনে থাকবে। আরবী ফারসী মেশানো বাংলা ভাষায় লিখিত ইসলামী ঐতিহ্যমূলক সাহিত্যকে বলা হয় পুঁথি-সাহিত্য। রচয়িতাদের সবাই ছিলেন মুসলমান। এ সাহিত্যের বিস্তার এবং পরিণতি ঘটেছিল বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত। এই পুঁথি রচনা করতে গেলেই কবিরা অনুসরণ করতেন ঐতিহ্যমূলক পুরান আরবী, ফারসী কেতাব। কারণ এই সব কেতাবের কেচ্ছাকাহিনীগুলোই যুগে যুগে আরব, পারস্য ও তুরস্কের জাতীয় জীবনের প্রেরণা জুগিয়েছে। বাস্তবিকই পুঁথির জগৎ এক অপূর্ব রহস্যময় এবং কল্পলোকের জগৎ। পুঁথি পড়্‌তে পড়্‌তে পাঠক-পাঠিকা মাত্রই নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান পায়; নিজের দুঃখ দৈন্যভরা জীবনে লাভ করে ক্ষণিকের জন্য সান্ত্বনা।

আজ বিদেশী ভাব ও সাহিত্যাদর্শ এসে পুঁথি-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা খানিকটা কমিয়ে দিয়েছে। কমিয়ে দিলেও এই পুঁথি-সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হবে না। আজ আবার পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর সামনে জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদ এসেছে বলে পুঁথি-সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব দান করেছেন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ।

এই পুঁথি-সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ হ'ল 'আলেফ লায়লার কেচ্ছা' বা সহস্র এক রজনীর গল্প। আরব্যোপন্যাসের এই গল্পগুলো বাংলা পুঁথি-রচয়িতা কবিগণ অতি সুন্দররূপেই অনুবাদ করেছেন আরবী, ফারসী মেশানো বাংলায়। বাংলা ভাষা ছাড়াও আরব্যোপন্যাসের চমকপ্রদ গল্প পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'আলেফ লায়লার' গল্পগুলো যেমন মজাদার তেমনি রসালো। একবার এই পুঁথি নিয়ে বস্‌লে তা আর কিছুতেই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না। মূল

আরব্যোপন্যাসের রচয়িতা কে ছিলেন সে সম্পর্কে যথার্থ কোন হদিস জানা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা এই যে, গল্পগুলো আরব দেশের বণিকদের আড্ডার গল্প। গল্পগুলোর মূল উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, এগুলো বাগদাদ অধিপতি খলীফা হারুন-অর-রশিদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুস্তকাকারে গ্রন্থিবদ্ধ হয়। এরপর থেকেই তার মর্যাদা বেড়ে গেল যথেষ্ট; এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি রসগ্রাহী পাঠক আরব্যোপন্যাস পাঠ ক'রে বিমুগ্ধ হয়েছেন। আলেফ লায়লা বা সহস্র এক রজনীর কাহিনীটি এবার তোমাদের কাছে বলি; এ পুঁথি পড়লে তোমরাও যে আনন্দ-কৌতুকে নিমজ্জিত হবে তা বাজি রেখে বলতে পারি। এবারে গল্প শোনো :

দুই ভাই। শাহরিয়ার আর শহরে-জামান। এঁরা দুজনেই কিন্তু দুই ভিন্ন রাজ্যের বাদশা। ভিন্ন হ'লেও রাজ্য দুইটি ছিল পাশাপাশি। এঁরা দু'জনেই বিয়ে করলেন; এবং তাঁদের নিজ নিজ স্ত্রী তাঁদের প্রতি রীতিমত বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। ফলে নারী জাতির প্রতি তাঁদের ঘেন্না ধ'রে গেল। বাদশাহ শাহরিয়ার কিন্তু নিজের স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে লাগলেন। তিনি ভুললেন নিজের মনুষ্যত্ব; ভুললেন যে তিনি রাজ্যের বাদশাহ। বাদশাহ আপন ইচ্ছেমত প্রতি রাতে রাজ্যের একটি যুবতী বিবাহ করে নিশি যাপন করতেন এবং প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কতল করতেন। হররোজ এমনি ধারা চলতে থাকল। এতে রাজ্যের অনূঢ়া মেয়েদের প্রাণ কেঁপে উঠল, এবং তাদের বাপমাদের বুকের রক্ত হিম হ'য়ে আসতে লাগল। সমগ্র রাজ্যব্যাপী পড়ে গেল এমনি হাহাকার। দিনের পর দিন নারীবধ যজ্ঞ চলতে থাকলেও রাজ্যের কেউ তার প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে বাদশাহের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াবে বা তাঁর কার্যে প্রতিবাদ জানাবে। রাজ্যের একটি নারী রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ব'লে বাদশাহ তার প্রতিশোধ নিচ্ছেন রাজ্যের অপরাপর যুবতীদের হত্যা ক'রে—এ যে ঘোরতর অন্যায়, সাহস করে একটি প্রাণীও সেকথা রাজার কাছে তুলতে পারল না। সমগ্র দেশে যখন বাদশাহের এমনি ধারা যুলুম চলছে, তখন যে রমণী নিজ বুদ্ধি বলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্য এগিয়ে গেল সে হ'ল বাদশাহ শাহরিয়ারের উজীর-কন্যা শাহেরজাদী। শাহেরজাদী ছিল অসামান্যা সুন্দরী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী। উজীর কন্যার প্রস্তাব শুনে চোখ তুললেন কপালে। কন্যাকে উজীর সাহেব নিরস্ত হ'তে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু শাহেরজাদী কার পরামর্শ শুনতে রাজী নয়। সে জানে মৃত্যু ত অবশ্যম্ভাবী; তথাপি চেষ্টা করতে আপত্তি কিসের? শেষমেষ সকলের আশঙ্কা সত্ত্বেও শাহেরজাদী বিয়ে করলেন বাদশাহকে; কিন্তু একি?—বাদশাহ উজীর-কন্যার অনুপম সৌন্দর্য দেখে আত্মহারা হ'লেন। বাদশাহ চিন্তা করতে লাগলেন, এ সৌন্দর্য ও লাবণ্য মানুষের? সারা রাত বাদশাহ শাহেরজাদীর সৌন্দর্য-সুধা

নিরীক্ষণ করলেন; হয়ত বা ভালবেসেও ফেল্‌লেন এই লাবণ্যময়ী নারীকে। রাত্রির শেষ যাম। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই; এমনি সময়ে শাহেরজাদী মিনতি জানালো যে, মৃত্যুর পূর্বে সে তার কনিষ্ঠা ভগ্নি দীনারজাদীকে একটিবারের জন্য চোখের দেখা দেখ্‌বে। শাহরিয়ার মৃত্যুপথযাত্রী লাবণ্যময়ী স্ত্রীর ফরিয়াদ মঞ্জুর না করে পারলেন না। শাহেরজাদীর মুখমণ্ডল হাস্যবিভাসিত হ'য়ে উঠল। দীনারজাদী এসে উপস্থিত হ'লে শাহেরজাদী কত বিষয়ে গল্প করেন ছোট-বোনের সংগে। সর্বশেষে দীনারজাদী বাদশাহ শাহরিয়ারের নিকট বায়না ধরলো জীবনের শেষবারের মত শাহেরজাদীর মুখ থেকে একটি গল্প শুন্‌বার জন্যে। বাদশাহ এটিও মঞ্জুর করলেন। শাহেরজাদী প্রথমে গল্প শুরু করলো 'এক সওদাগর এবং জেলের' কেচ্ছা দিয়ে। গল্প যখন বেশ জমজমাট হ'য়ে উঠেছে, তখন রাত্রি প্রভাত হ'ল। গল্প শুনে বাদশাহ বিভোর হ'লেন, আর বললেন শাহেরজাদীর গল্পের বাকি অংশ পরের রাতে শোনাবার জন্যে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেক সকাল বেলাতে যে নারীহত্যা চলত, সেই চিরাচরিত রীতি এই সর্বপ্রথম স্থগিত রইল। উজীর-কন্যা শাহেরজাদীও রেহাই পেল সেদিনের মতো। বাদশাহের হুকুমমত দ্বিতীয় রাতে গল্প শুরু হ'ল আবার; ভোর হবার সাথে সাথে গল্প জমাট বেঁধে উঠ্‌লো; শাহরিয়ার আদেশ করলেন বাকি অংশ পরের রাতে শোনাবার জন্যে। তারপর পরের রাতে শাহেরজাদী আবার গল্প বলা আরম্ভ কর্‌ল এবং বাদশাহের শ্রবণ-যুগল পরিতৃপ্ত ক'রে তার মায়াময় আনন্দ-পূর্ণ গল্প এগিয়ে চল্‌ল। এবারেও ভোর হবার সাথে সাথে জমে উঠ্‌ল গল্প। বাদশাহ পরের রাতে অবশিষ্টাংশ শুন্‌বেন বলে বক্তাকে গল্প থামাতে বল্‌লেন। এমনিভাবে উজীর-কন্যা শাহেরজাদী 'সহস্র এক রাত্রি' ধ'রে বাদশাহ শাহরিয়ারকে গল্প শোনাতে লাগলো; এবং তাঁর নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয় জয় ক'রে নারী-হত্যার পাপ থেকে বাদশাহকে বাঁচালো; রাজ্যও পাপের ভার থেকে মুক্ত হ'ল। সাথে সাথে শাহেরজাদী আরও এক কাজ কর্‌তে সক্ষম হ'ল। এ্যাদ্দিন পর্যন্ত নারী জাতির প্রতি বাদশাহ শাহরিয়ারের গভীর বিতৃষ্ণা এবং অশ্রদ্ধা ছিল; তার পরিবর্তন সাধন করে বাদশাহ মনে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার ভাব জাগ্রত কর্‌তে সক্ষম হ'লেন।

এইখানেই 'আলেফ লায়লার' গল্প সমাপ্ত হ'ল। সহস্র এক রজনীর গল্পগুলো পাঠ কর্‌তে কর্‌তে পাঠক-পাঠিকা যে রসলোকে ডুবে যায় তার সন্ধান পেতে হ'লে তোমাদেরও হতে হবে ডুবুরীর ন্যায় একাগ্রচিত্ত এবং পরিশ্রমী। 'আলেফ লায়লার' মত এমন অপরূপ কাহিনী তোমরা না পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই পড়্‌বে।

ব্যস্ত-ববি

॥ জসি রহমান ॥

পোঁ পোঁ হর্ণ বাজে
বাস বুঝি এলরে,
মা বলেন, "ওরে রেজি,
ববি ভাত খেলোরে ?"

আধো-বাঁধা বেনী-হাতে
ফিতে খুঁজে পায় না,
পা দু'টো যেয়ারা যে
জুতো মাঝে যায় না।

মুখ ভোঁতা পেনসিল,
ব্যাকরণ খাতা কই ?
ওরে ডেজী, খোঁজ নারে
সদা তোর হৈ হৈ ?

বাস বুঝি গেল চলে,
একটু বলো না দাই,
তাড়াতাড়ি এত কর
কিছুই পাই না ছাই।

টিফিনের পয়সা, মা
আগে কেন দাও না ?
স্কুল যেতে দেরী হয়
বুঝ্‌তে তা চাও না।

এই ডেজী, ছুটে যা,
আন দেখি বইটা,
বাবা, বাবা, এই খানে
দাও করে সইটা।

সই তুমি কিসে দিলে
বলব তা রাতেতে,
আজ এটা দেওয়া চাই
বড়'পার হাতেতে।

দূর ছাই পাউডার—
আর মাখা হলো না।
যাক্‌গে, যাই চলে
দরজাটা খোল মা।

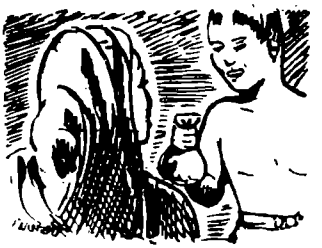

গল্প হ'লেও সত্যি

॥ অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ॥

আমি, নিবারণ, চতু, সন্তু, নন্তু, রবি আর ছুলু—আমাদের সাত জনের ছিল গলাগলি ভাব। খেলা-ধূলা আমরা এক সাথেই করতাম; স্নানে যেতাম এক সাথে; এক সাথে বেড়াতে বেরুতাম। সবাই বলত—"সাত ভাই চম্পা।"

প্রত্যেক বার শীতের সময় আমরা সাত বন্ধু মিলে যাই বনভোজনে। এবারও গিয়েছিলাম; কিন্তু এবার গিয়ে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য, আর সত্য ঘটনাই বোধ হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে নিদারুণ এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। বানিয়ে হয়ত মানিয়ে বলা চলে, কিন্তু যা নিছক সত্য, অদ্ভুত হ'লে তাকে মানানসই রূপ দেওয়া বুঝি অসম্ভব।

সেদিন শুক্রবার। ছুটির দিন। আমরা সাত জনে পদ্মার জলে খুব খানিকক্ষণ ঝাঁপা-ঝাঁপি করলাম। কাছেই ছিল একটা নোঙর করা নৌকা, বেশ বড়। নৌকা থেকে আমরা কয়েকবার জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নিবারণের উৎসাহই সকলের চেয়ে বেশী। আমরা দু-একবার ঝাঁপিয়ে পড়েই ক্ষান্ত হলাম; সে কিন্তু সব সময়টা ঝাঁপ খেলেই কাটাল।

শীতের দিন, বেশীক্ষণ জলে থাকা মুশকিল। আমরা তাড়াতাড়ি উঠলাম। নিবারণকে বহু কষ্টে নিবারণ করা হ'ল। খেলাটায় সে বেশ মজা পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছিল। সাঁতার কেটে এবং ঝাঁপ খেলে সকলেই পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। নিবারণকে সবচেয়ে বেশী ক্লান্ত মনে হ'ল। মাস দেড়েক হ'ল ও প্লুরিসি থেকে উঠেছে। জলে এতক্ষণ লাফালাফি করা ওর ঠিক হয়নি। আমরা সব শুক্‌নো কাপড় পরে বাড়ীর দিকে পা চালালাম। নিবারণ কাপড় আনতে ভুলে গিয়েছে; সে ভিজা কাপড়েই চল্‌ল।

যেতে যেতে আমরা ঠিক করলাম: কাল শনিবার, ২৫ শে ডিসেম্বর, ছুটির দিন। সুতরাং কালই যাওয়া যাবে বনভোজনে। রেল লাইন পেরিয়ে "সঁপুরার জঙ্গল"। সেই জঙ্গলে একটা পুকুর আছে. আর আছে একটা ভাঙা পুরোনো মন্দির—ক'শ' বছরের, কে জানে! পুকুর আর মন্দিরের চারদিক্ ঘিরে ঘন বন। এক কালে বাঘ থাকত। আজকাল শের সাহেব আর থাকেন না, থাকে শেয়াল, কাঠ বেড়াল, খরগোশ আর সাপ। শীতকাল, সাপের ভয় অবশ্য বিশেষ নেই। বনভোজনের এর চেয়ে ভাল জায়গা এতল্লাটে আর নেই।

বিকেল বেলা। ক্রিকেট খেলতে মাঠে এসে দেখি সবাই এসেছে, আসেনি শুধু নিবারণ। তাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসতাম। সে না এলে না জমত খেলা, না জমত আড্ডা। আমি গেলাম নিবারণকে ডাকতে। দেখি, সে শুয়ে আছে। একটু যেন টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

নিবারণ বললে : আমার শরীরটা কেমন যেন ভাল লাগছে না রে। বাড়ীতে কাউকে বলিনি। বুকটায় খুব ব্যথা। আজ আর খেলতে যাব না। আমি বল্লাম : অসুখ কি খুব বেশী মনে হচ্ছে ?

: না, না, ও কিছু না।

এই ব'লে সে হাসতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ভাল ক'রে হাসতে পারলে না। তার যেন কেমন কষ্ট হচ্ছে মনে হ'ল।

: তোর মাকে বলি। ডাক্তার এসে দেখুন।

: না, না, আমি তো ভালই আছি। মাকে ব'লে কি হবে। মা আবার একটুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মাকে বলিস্ না ভাই।

: কালকের বনভোজনটা বরং বন্ধ থাক। তোর উপরই তো সব ভার।

: বন্ধ থাকবে কেন ? সব জিনিস তো ঘরে মজুদ হয়ে গেছে। স্নান ক'রে এসেই বাজার থেকে সব কিনে এনে রেখেছি।

কথাগুলো বলতে সে খুব হাঁপিয়ে উঠল।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে খেলাধূলা সেরে যে যার মত বাড়ী চলে গেলাম।

* * *

পরের দিন।

তখনো ভোর হয়নি। চারদিকে ঝাপ্‌সা অন্ধকার। নিবারণ ডাকছে ব'লে মনে হ'ল।

ধড়মড় ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুমের চোখে ঘরের বাইরে উঠানে এসে দেখি, হাঁ, সত্যিই তো নিবারণ। বাব্বা ! কত জিনিস এনেছে—আলু, কপি, বেগুন, চাল, ডাল, নুন, তেল, বাসন-পত্র, টুকি-টাকি আরো কত-কি।

: তোর চাকর কই ? বাপ্‌রে ! এত জিনিস আন্‌লি কখন ? আমি বললাম।

: চাকর উঠার আগেই আমি এসে ফেলেছি। সে বললে।

: কি সর্বনাশ ! বলিস্ কি ? তোর না শরীর খারাপ ? রাত থাকতে এগুলো আনতে গেলি কেন ? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। বেলা হ'লে আমরা সব এক সাথে জুটে নিয়ে আসতাম।

: আমার এখন কোন রোগও নেই, কষ্টও নেই।—শুনে অবশ্য খুশী হলাম।

সে ব'লে চলেছে : ভাই, তোরা পিকনিকে যাস্। তোদের সাথে আমি যেতে পারবো না। তোরা যেখানে যাবি, আমি ঠিক সেখানে গিয়ে হাযির হব ; চিন্তা করিস্ না।

: তা কি ক'রে হয় ? তুই না গেলে যে পিকনিক জমবে না।

: ঠিক যাব। এখন আমাকে ছেড়ে দে। আর থাকতে পারছি না, অসুবিধা হচ্ছে। উপায় থাকলে নিশ্চয় তোদের সাথে যেতাম।

একটা আবছা আঁধারে চারদিক্ ছেয়ে-ছিল। নিবারণকে দেখলাম ছায়ার মত, ধীরে ধীরে অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল। কিন্তু তাকে ঠিক দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম, তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা বিমর্ষ ভাব মাখানো আছে।

অনেক দূর থেকে ভেসে এল নিবারণের কথা : দেখ্ আমার বাড়ীতে যেন যাস্ না। তা হ'লে কিন্তু আমার আর পিক্‌নিকে যাওয়া হবে না।

বুঝলাম, তার বাবার বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে সে পিকনিকে যায়। কিন্তু তার বাবা তো প্রতি বৎসর তাকে উৎসাহ দিয়ে আমাদের সাথে পাঠিয়েছেন। এবার হ'ল কি! মানুষের মন, বদলাতে কতক্ষণ? তার অসুখের জন্য হয়ত তার বাবা তাকে যেতে দিতে চান না।

তাকিয়ে দেখি, বাঘা কেমন কুঁকুঁ ক'রে ডাকছে। বাঘা আমার কুকুর। এতক্ষণ ও যেন কেমন অসাড় হয়ে পড়েছিল, শীতের জন্যই হ'বে। ধীরে ধীরে আলো ফুটতেই নিবারণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর বাঘা উঠে দাঁড়িয়েছে। মনে হ'ল, কুকুরটা কেমন যেন ভয় পেয়েছে, গলা দিয়ে ওর যেন ভাল ক'রে স্বর ফুটছে না। আমার নিজের মনে হ'ল, আমি যেন এতক্ষণ কেমন আচ্ছন্নের মত ছিলাম। নিবারণকে ভাল ক'রে দেখাও হয় নি, তাকে বসতে বলতেও ভুলে গেছি।

কি আশ্চর্য, বাইরের দরজা যে বন্ধই আছে। বাড়ীর চারদিকে প্রাচীর। নিবারণ উঠানে এলোই-বা কোন্ দিক্ দিয়ে আর গেলই বা কোন্ পথ দিয়ে! চোখ রগড়ে দেখি, না, জিনিসপত্র সব তো উঠানে ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। এতগুলো জিনিস দেওয়াল ডিঙিয়ে আনা তো সোজা ব্যাপার নয়! চুপ ক'রে রইলাম। কাকেও কিছু বলতে গেলে সে ঠাট্টা করবে—মাথা খারাপ! ঘুমের ঝোঁকে কি বলেছে,কি করেছে, কি দেখেছে, তার ঠিক কি!

* * *

একটু বেলা হতেই বন্ধুরা সব হাযির হ'ল। নিবারণের নিষেধ শুনে তাকে ডাকতে যাওয়ার ইচ্ছা দমন করলাম। তার জন্য মন-মরা হয়ে হাতে হাতে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

সঁপুরার সেই পুকুরের কাছে জঙ্গলে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম। কোন্ জায়গায় রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করা যায়, আমরা চিন্তা করছি। কাছেই একটা জায়গা কে যেন পরিষ্কার করছে ব'লে মনে হ'ল। হঠাৎ যেন নিবারণের গলা শুনতে পেলাম : এখানে আয়।

যেয়ে দেখি, চারদিকে বড় বড় গাছ আর লতা-পাতায় ঢাকা সুন্দর একটা জায়গা। গাছের ডাল কেটে পাতা ভেঙে লতা ছেঁটে কে যেন বেশ চমৎকার ক'রে সাফ করেছে। বুঝলাম, নিবারণ আগে-ভাগে এসে কাজ সেরে রেখেছে। তিন-চার ঘণ্টার কমে একজন লোকের পক্ষে এতটা জায়গা পরিষ্কার করা অসম্ভব। নিবারণ কখনই-বা এলো, কখনই-বা সাফ করলো। যা হোক, সে এসেছে ব'লে আমরা সকলেই বেশ খুশী হয়ে উঠলাম। কিন্তু নিবারণ কোথায়?

: নিবারণ, নিবারণ।

আশ্চর্য! কোন সাড়াশব্দ নাই। বোধ হয়, একটু দূরে গেছে, ডাক শুনতে পাচ্ছে না। মনের আনন্দে একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

চতুকে বললাম : আচ্ছা, আমরা তো একটু আগে এই পথ দিয়ে গেলাম। ঐ তো দু'পাশে দুটো বাঁশ ঝাড়, আর ঐ তো বাঁকা-তেড়া আম গাছটা রয়েছে। কই, নিবারণকে তো জায়গা সাফ করতে দেখিনি।

নন্তু আমায় এক তাড়া দিলে : জায়গা কি ভূতে সাফ ক'রে গেল। বাজে কথা বলছিস কেন? তোর চোখ খারাপ হয়েছে।

স্বীকার ক'রে নিলাম যে চোখ খারাপ হয়েছে। কথা বাড়িয়ে কি হবে? শেষ রাত্রি থেকেই আশ্চর্যজনক ব্যাপারগুলো ঘটতে শুরু করেছে। যাকগে। এখন একটা উনুন খুঁড়তে হবে। বললাম : একটা উনুন খোঁড়া দরকার। কিন্তু 'দা', 'খন্তা' বা 'শাবল' কিছুই যে আনা হয়নি।

জিনিসপত্র রেখে আমরা একটু বিশ্রাম নিতে লাগলাম। হঠাৎ সন্তু বললে : আরে! নন্তুর পাশেই যে উনুন খোঁড়া আছে। একেবারে নূতন উনুন, টাটকা মাটি তোলা হয়েছে। তিনটা ইট পর্যন্ত বসান আছে।

নন্তু বললে : সে কি! আমি তো ব'সে আছি। কই, কোন উনুন তো দেখিনি! একি কাণ্ড রে বাবা!

এবার আমার ঠাট্টা করার পালা, বললাম : নিবারণই উনুন খুঁড়ে রেখে গেছে। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস ব'লে দেখতে পাসনি।

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

নন্তু বললে : আরে না, আমি তো আমার এ পাশের জায়গাটা ভাল ক'রে দেখেছি। একটু আগেও এখানে উনুন ছিল না, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। তোরা বললেই মেনে নেব?

সকলেই তাকে ঠাট্টা করতে লাগল। আমিই শুধু চুপ ক'রে রইলাম।

সন্তু আর আমি ছুরি দিয়ে তরকারি কুটতে কুটতে গল্প করতে লাগলাম। অন্য সকলে গেল কাঠের সন্ধানে। গল্প করতে করতে পিছন পানে চেয়ে দেখি, স্তূপাকার শুকনো কাঠ। বাব্বা, এত কাঠ কে কখন আনল। গল্প করতে করতে টের পাই নি তো; কোন শব্দও হয় নি, আশ্চর্য!

বহুক্ষণ বাদে বাবুরা ফিরলেন। কারো হাতে কিছুই নেই, কারো হাতে-বা দু-একটা শুকনো মরা ডাল। কুড়ুল বা দা কিছুই সাথে নেই, তাঁরা কি করবেন! ফিরে এসে এত কাঠ দেখে তো সবাই অবাক। সবাই বুঝলে এ নিবারণের কাণ্ড। কিন্তু এত লাকড়ি তার একার পক্ষে আনা যে অসম্ভব! সে গেলেই বা কোথায়? অনেক ডাকাডাকি ক'রেও তার সাড়া-শব্দ মিলল না। আড়ালে আড়ালে এতক্ষণ গায়েব হয়ে রইল। কি জানি বাবা, কেমন ধারা রসিকতা!

রবি রাঁধতে লাগল। ও-ই আমাদের মধ্যে কিছুটা রাঁধতে জানে। আমি অপটু হাতে ওকে সাহায্য করছি। আর কেউ ভিড়ল না রবি তাদের বললে : আচ্ছা, খাবার বেলা দেখা যাবে।

তারা হেসে যে যার মত গল্পগুজব করতে করতে জঙ্গলে বেড়াতে লাগল। জল ফুরিয়ে

(৬০৬ পৃঃ দ্রঃ)

খুকুমণির জন্মদিনে

॥ আশরাফ সিদ্দিকী ॥

খুকুমণির জন্মদিনে চাঁদের মাসী দেখতে এলো
নীল আকাশের চাঁদের নায়ে চ'ড়ে,
তাইতো তাহার সোনার দেহে চাঁদের সুধা ঝরে !
খুকুমণির জন্মদিনে তারারা সব হেসে হেসেই সারা—
তাইতো তাহার নয়ন দু'টি হয়েছে ভাই এমন তারার পারা !
খুকুমণির জন্মদিনে মেঘ মেয়েরা দল বেঁধে যে ভাই—
দেখতে এলো—তাইতো তাহার রেশমী চুলে
এমন কাজল মেঘের রোশ্‌নাই !
চাঁপারা সব আঙুল দিল—বিজলীরা সব দিল যে তার হাসি,
পাখীরা সব কথা দিল—সেই কথা যে ফুটছে রাশি রাশি !
কোথায় আছে স্বপ্নপুরী—স্বপ্নঘেরা শঙ্খমালার হুর,
কোথায় বহে তের নদী সপ্ত সমুদ্দুর,
বেঙমা আর বেঙমীদের গানে ভরা স্বপ্ন-তেপান্তর
কোথায় আছে—কোথায় হাসে রত্নাবতীর চর !
সকল দেশের রূপকথা যে এই খুকীটির সোনার দেহে ভ'রে
কোন্ সে কবি ভাসিয়ে দিলে এই ধরণীর 'পরে।
এইযে মাটি—কঠিন মাটি—এইযে ধুলি—এইযে আবর্জনা
এই খুকীকে এই এখানে রাখতে যে ভাই মানা !
এইযে রবি—দীপ্ত রবি—এই রোদেতে রাখলে তারে হায়—
আমরা যে সব ভয়েই মরি—শুকিয়ে যদি যায় !
এইযে বাতাস—উতল বাতাস—এই বাতাসে রাখলে তারে হায়
ভয়েই মরি—এই কলিটি উড়েই বুঝি যায় !

হারাই হারাই ভয়ে যে তাই—আমরা সবাই ভেবেই নাহি পাই—
এই মণিটি কোথায় মোরা লুকিয়ে রাখি ভাই !
এই মণিটি বক্ষে ধরে মা যে তাহার হ'লো মহামায়া,
এই কলিটি চক্ষে নিয়ে বাপ যে পেল নীল কমলের ছায়া !
এইযে মাটি—এইযে ধুলি—এই ধুলিতে—এই খুকীটির হাসি—
সকল ব্যথা ভুলিয়ে হেথায় স্বর্গ নিয়ে আসলো রাশি রাশি !!

নূতন ও পুরাতন

॥ মুহম্মদ সুলতান বি, এস্, সি, বি টি ॥

●

নূতন পাতায় সবুজের লেখা
প্রাণ-চঞ্চল বাণী ;
কত না আশার রঙীন্-স্বপন
করে সেথা কানাকানি।
পুরাতন পাতা তাই ভরসায়
বুক বাঁধে ঝরে যায়,
চির-কামনার কুসুম তাহার
বুঝি-বা ফুটিবে হায় !

আপাভাই

॥ মিল্লাত আলী ॥

আমি তখন এইটে, মিনু ক্লাস নাইনে। 'দৈনিক খবর'-এর 'ছোটদের মজলিশ' আমরা দু'জনে দখল করে আছি। সপ্তা-সপ্তা হয় আমার কবিতা, আর নয়তো মিনুর গল্প থাকবেই। পরিচালক "ভাইজান" আমাদের দু'জনের লেখা ছাড়া যেনো আর লেখাই পান না। আমাদের সে কি ফুর্তি! পাঠ্য পড়া এক পাশে রেখে দিয়ে আমরা সাহিত্যচর্চায় মনঃ সংযোগ করেছি।

ওই সময়েই আপা ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। সে দিনটি বেশ মনে আছে। শেষ রাত থেকে অবিশ্রাম বিষ্টি। আটটা-ন'টা পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা সকাল দশটার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় বিষ্টিটা যেনো কিছু ধরে এলো।

: এইরে চিনু, সেরেছেরে।—মিনু বললে, "ইস্কুলে বুঝি যেতে হয়!"

: কি যে বলো তুমি। আল্লাহ বুঝি আমাদের মুনাজাত কবুল না করে পারবেন। ছ্যাখে নিও, আমি বলছি, বিষ্টি কিছুতেই থামবে না।

আল্লাহকে মেহেরবানই বলবো, কারণ সাড়ে দশটা পার হয়ে গেলো, বিষ্টি আর থামলো না। আমাদের তখন আর পায় কে! আব্বাকে বলবো 'খন, "আজ রেইনি-ডে, ইস্কুল বন্ধ।"

ক্যারম বোর্ড নিয়ে বসেছি। আমি আর মিনু—সিংগল্‌ই খেলবো।

ক্যারম মেন সাজিয়ে খার্ড পকেট এইম করে ষ্ট্রাইকার ছুঁড়ছি, এমন সময় বারান্দায় পিওন ব্যাটা ডেকে উঠ্‌লো: চিঠি নেন—চিঠি।

কোথা গেলো ষ্ট্রাইকার, কোথা রইলো ক্যারম—আমরা দু'জনেই দৌড়ে যাই বাইরে।

একখানা মাত্র চিঠি। আমারই নামে।

আশ্চর্য! এমন হস্তাক্ষর তো আর দেখি নি! কে লিখলো? নতুন কেউ "লেখনী বন্ধু" করতে চায় নাকি?

: কে লিখেছে রে?

: বুঝছি না তো।

: কৈ, দে' তো দেখি!

: কেন্—আমার চিঠি তোমাকে দেবো কেনো?

ততোক্ষণে লেফাফা ছিঁড়ে চিঠি বা'র করে ফেলেছি।

পলকে পড়েও ফেললাম আশ্চর্য চিঠিখানা।

: তোমার সাথে 'সই' পাত্‌তে চায়।

: সই? আমার সাথে! কে রে, দেখি?

: এই ছ্যাখো না কি লিখেছে—"চিনু, আমার চিঠি পেয়ে অবাক, নির্বাক অথবা হতবাক যে বাক্‌ই হও না কেনো, আর চিঠিখানা পড়ে' তোমার চোখ দু'টি বড়ো হতে হতে ছানা বড়া হয়ে চড়ক গাছেই চড়ুক না কেনো, আমি কিন্তু লিখবোই। কেননা, তোমরা যে আমার অনেক দিনের পরিচিত।

তোমরা দু'টি বোনের সাথে কতোদিন আমি সিনেমা দেখলাম, কতো দিন ব্রহ্মপুত্রের চরে চড়ুইভাতি খেলাম! আর আমিও খুব অপরিচিত নই তোমাদের কাছে। মনের গহ্বরে একবার স্মরণের টর্চ বাতি জ্বালাও, দেখতে পাবে—তোমরাও আমার সাথে মেঘনার পুলে ঘুরাঘুরি করেছো, মেঘনার তীরে তীরে মেঘহীন আকাশের নীলিমা দেখেছো। কি, মনে পড়ছে না? তা' হ'লে মেমরি পরীক্ষায় তোমরা দু'জনেই লাড্ডু।

আচ্ছা চিনু, মিনুকে বলো তো ও আমার সাথে সই পাতবে কি না। আমি কিন্তু সতেরো আনা রাজী। হ্যাঁ, চিঠির জবাব দিও, নইলে কিন্তু তোমাকে তা-রী অভদ্র ভাববো। আমার অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা নাও। ইতি—তোমার আরেক মিনু আপা।"

: মিনু! অবাক করলে বটে। —চিঠি পড়ে মিনু বলে, "কৈ, মিনু নামে কোনো মেয়ের সাথে তো কোনো জনমে আমার পরিচয় ছিলো না।"

: আমারও ছিলো না। আমি জানাই।

: তবে কে এই মিনু, আমাদের সাথে সিনেমা দেখেছে, আবার আমরাও তার সাথে মেঘনার পুলে উঠেছি! আচ্ছা, দেখি তো মিনুর ঠিকানাটা।

: এই ছাখো না—ঝরণার পাড়, সিলেট।

: সিলেট? —মিনু কতক্ষণ চুপ করলো। আবার বললো সে, "জানিস চিনু, তোর জন্ম হয়েছিলো কিন্তু সিলেট—শ্রীমঙ্গল। আব্বা একবার সিলেট ষ্টেশনেও ছিলেন অনেক দিন। তোর হয়তো মনে নেই, সিলেটের কীন ব্রীজ—সুরমার পাড়ে বড় ঘড়ি ঘরটা—তোকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতাম ওখানটায়। তবে কি সে সময়েই মিনুর সাথে পরিচয়?

: আরে দূর্—কী যে বলো। কোথা কীন ব্রীজ, কোথা মেঘনার পুল। সিলেট আর ভৈরব—মাথা খারাব হলো তোমার!

সেদিন সত্যিই আমাদের মাথা খারাব হবার যোগাড় দু'জনে মিলে আসমান-জমিন কতো কি ভাবলাম, কিন্তু মিনু রহস্য আর উদ্ঘাটিত হয় না।

অবশেষে আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসে। আর আসবেই-বা না কেনো? অতো "মোহন সিরিজ" পড়ে কি একটুও ফায়দা হবে না? মিনুকে বললাম, "তুমি কিস্সু বলো না, আমি সব রহস্যের জাল ছিঁড়ছি, ছাখো।"

পরের দিনই নতুন মিনু আপাকে লিখলাম : হ্যাগো মিনু আপা, তোমার চিঠি পড়ে আমরা এ্যাত্তো খুশী হয়েছি, প্রশান্ত মহাসাগরকে একখানা দোয়াত আর দুনিয়ার সব বাঁশ গাছকে একটি কলম বানিয়ে যদি আকাশ-রূপ কাগজে সারা বছর-ভর লিখি, তবু তা প্রকাশ করা হবে না। হ্যাঁ, মিনু তোমার সাথে সই পাতাতে রাজী। তবে তার একটা সর্ত আছে। সে বলেছে, কেবল নাম শোনেই সই পাতা যায় না, তার ধামও চাই। আর আমি জানতে চাই, নাম-ধামহীন তোমার চিঠি শুধু হেঁয়ালী, না ওটা তোমার এক রকম খেয়ালই। মনে রেখো, ঘোড়া ডিংগিয়ে ঘাস খেতে পারবে না

–মিন্নুর সাথে সইই পাতো আর যাই পাতো ই চিন্নুদেবীকে ফাঁকি দিলে কিন্তু নিজেই াকে পড়বে।”

চিঠি দিয়ে দিন গুনছি, তিন দিন, চার দিন ায়ে সপ্তা পার হয়ে গেল, জবাব আর পাই না। াপার কি ?

আট দিনের দিন চিঠি এলো—মিন্নু আপার াছ থেকে নয়—ওহাব ভাইয়ের কাছ থেকে। লখনী-বন্ধু ওহাব ভাই ঢাকা থেকে লিখেছে : 'আজ একটা সুখবর পেলাম। সিলেট 'কাঁচা মেলা''র আহ্বায়ক আমাদের "খেলার াসর" এর নিয়মিত লেখক নিসার আলী মানে াামাদের মিন্নু ভাই-এর সাথে নাকি তোমাদের াত্রালাপ হচ্ছে। হ্যাঁ লিখো, মিন্নু ভাই ভারী াামোদে লোক, আমার সাথে গত মাস থেকে পরিচয়।”

ও আল্লা, মিন্নু আপা তা' হলে আসলে াাপা নয়—মিন্নু ভাই! ভাই হয়ে এসেছিলো মিন্নর সাথে সই পাত্‌তে। আচ্ছা, রসো আপামণি, দেখাচ্ছি মজা। মনে রেখো, তুমি থাক তো গাছে গাছে আমি থাকি পাতায় পাতায়।

কিন্তু মজা দেখানোর আর সময় পেলাম না। পেলাম সিলেট থেকে মিন্নু আপার চিঠি।

"চিন্নু, তোমার চিঠি পড়ে বড়ো দুঃখ পেলাম। কারণ তুমি (এমন কি তোমার চে' বয়সে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-জ্ঞানে বড়ো মিন্নু-ও) আমার চিঠিকে রহস্যময় বলে এখন আমাকেই আরেক রহস্যে ফেলে দিলে। আচ্ছা বোকা মেয়েদ্বয়, তোমাদের লেখাতে কি সিনেমা ও ব্রহ্মপুত্রের কথা লেখো নি ? তোমাদের সে লেখা পড়তে পড়তে পাঠক হিসেবে আমিও কি সে সব বর্ণিত স্থানে অশরীরীভাবে গিয়ে উপস্থিত হইনি ? অনুরূপ আমার লেখাতেও কি তোমরা মেঘনার রূপ দেখো নি ? এতো-দিন তোমাদের খুব বুদ্ধিমতী ভাবতাম, এখন দেখছি, মাথা ভর্তি তোমাদের কেবল কেশ-গুচ্ছই, আর কিছু নয়।"

মিন্নু আমি দু'জনে মিলে এবার লিখলাম, "মিন্নু আপা, অতোক্ষণে আমরা তোমাকে স্মরণ করতে পারছি। এখন বেশ মনে পড়েছে, তোমাকে দেখেছি, হ্যাঁ, সত্যি দেখেছি। সেদিন সারা আকাশে অমাবস্যার পূর্ণ চাঁদ। সুরমা নদীর পশ্চিম পাড়ে ঘড়িঘরটার নীচে এক বুড়ো একা বসে। বুড়োর মুখভরা দাড়ি। বুড়োটি আনমনে দাড়ি থেকে উকুন বাছ্‌ছে আর ছোট একটি পাথরে উকুন-টিকে রেখে আরেকটি পাথর দিয়ে তা মারছে। অতোক্ষণে মনে পড়লো, সেই বুড়োটিই আমাদের মিন্নু আপা, তাই না ?"

দু'দিন পরে মিন্নু আপা লিখলো : "ঠিক চিনেছো চিন্নু। সে রাত্রে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে আমিই বসেছিলাম তোমাদের অপেক্ষায়। আমি একবার চেয়ে দেখলাম, তুমি আর মিন্নু আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছো। আমি তোমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, 'চিন্নু আপু, আমার উকুন ক'টি বেছে দাও না ভাই লক্ষ্মিটি!'

তোমার আপা ভাইয়ের কথা এড়াতে পারো নি সেদিন। তুমি কাছে এসে একটু,

নুয়ে যেই আমার দাড়িতে হাত দিয়েছো, অমনি আমি আমার সব উকুন চালান দিয়ে দিলাম তোমার মাথায়। বিশ্বাস না হয়, হাত দিয়ে ছাখো, তোমার মাথায় কেবল উকুন আর উকুন।"

আমি লিখলাম, "আপাভাই, তোমার অশিক্ষিত, গোঁয়াড় উকুনের জ্বালায় আমি পাগল হতে বসেছি। রাতদিন ওরা আমার মাথাকে মঞ্চ মনে করে যেভাবে নাটকের মহড়া দিয়ে চলেছে, তাতে আমার মাথা বেহেড হবার যোগাড়। তুমি পত্রপাঠ না করেই চলে এসো, আর নয়তো উকুন রপ্তানীর আশু ব্যবস্থা করো। নইলে কিন্তু আমি আইনের শরণ নিতে বাধ্য হবো।"

আপাভাই জানালো, "সামনে পরীক্ষা বলে আসতে পারলাম না। আমার উকুনগুলির জন্য উড়ো-জাহাজ পাঠালাম।"

পরের দিনই আপাভাইয়ের আরেক চিঠি। লেফাফায় টিকিট রয়েছে, কিন্তু চিঠির টিকিটি-ও নেই। রয়েছে শুধু একখানা কাগজের তৈরী ছোট্ট উড়ো জাহাজ। তা'তে গুট্‌গুট্ ইংরেজীতে লেখা—To carry lice.

তারপর থেকে আমাদের এই আপাভাইটির কাছে কতো চিঠি লিখেছি, আর কতো শতো যে পেয়েছি, তার আর লেখাজোখা নেই। চিঠি লেখায় দেখলাম, আমি যদি উঠি পাতায় পাতায়, আপাভাই চলে লতায় লতায়। এই করে করে হুস্ করে চলে গেলো একটি বছর।

আমি পাশ দিয়ে উঠ্‌লাম নাইনে, মিনু গেলো টেনে, আর আপাভাই? আশ্চর্য, অতোদিনের পত্রালাপ, ওর ব্যক্তিগত কোনো খবরই পেলাম না আমরা। অদ্ভুত সংযম বটে!

এমনি সময়ে একদিন আপাভাই জানালে, "আমার আব্বা তোমাদের শহরে বদলী হয়ে আসছেন। আমিও আসছি সাথে। মেট্রিক রেজাল্ট আউট হতে বড় বাকী নেই। তোমাদের কলেজেই এ্যাডমিশন নেবো ভাবছি। হ্যাঁ, কাছে আসছি বলেই যে তোমাদের সাথে দেখা হবে এ কিন্তু ভুলেও মনে করো না।"

মিনু আমায় বললে: ননারে, আপাভাই এখানে এলে আমাদের বাসায় আনা উচিত। অতোদিনের পরিচয়—অন্ততঃ একটা ভদ্রতা আছে তো?

: আরে, আনা উচিত মানে? আনবো না, একদিন ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে আসবো, ছাখো। চিঠি তো মশায় ভালোই লেখে, একবার দেখি না আলাপে কেমন?

তারপর বেশ ক'দিন আপাভাইয়ের কোনো খবর নেই। ইতিমধ্যে মেট্রিক রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। আপাভাইয়ের কোনো খবরই জানতে পেলাম না।

খবর পেলাম ওহাব ভাইয়ের। ওহাব ভাই ঢাকা থেকে লিখেছে, "মিনু ভাইয়ের খবর নিশ্চয় পেয়েছো—সে বাংলা সাহিত্যে বোর্ডে প্রথম হয়েছে। চার নম্বরের জন্য মিনু ভাই স্টার পেলো না। কিন্তু বড়ই আশ্চ

সোসের কথা, মিনু ভাই নাকি গত দিন দশেক ধরে বসন্ত রোগে ভুগছে। তোমরা দোআ করো।"

চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমাদের আপাভাইয়ের বসন্ত? বাংলাতে ও বোর্ডে হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছে? চার মার্কের জন্য ষ্টার পায় নি? আপাভাইয়ের জন্যে আজ হঠাৎ কেনো জানি দারুণ কান্না পেলো আমার। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বল্লাম, "খোদা, তুমি আমার আপাভাইকে সুস্থ করে দাও।"

পাঁচ মাস পর।

আপাভাই এখানকার কলেজে ভর্তি হয়ে রীতিমতো ক্লাস করছে। ডাক বিভাগ মারফত আলাপ হয় মাঝে মাঝে। কতো দিন কতো বার কতো অনুরোধ করলাম, উহুঁ, আপাভাই কিছুতেই আমাদের বাসায় আসবে না। বরং আপা আমাদের বোঝায়, "আরে বোকা, জীবনে অন্ততঃ এমন একটা স্থান রিজার্ভ করে রেখে দাও—যেদিন কোনো কিছুতেই মন বসবে না, ভালো লাগবে না, সেদিন চলে যাও সে স্থানে। আনন্দ পাবে, তৃপ্তি পাবে। তোমাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা আর আন্তরিকতা ভরা বাসাটা আমার ভবিষ্যতের জন্যে রইলো।"

চললো দিন।

আপাভাই একদিন নেমন্তন্ন করলো, "আমাদের কলেজের এ্যানুয়েল স্পোর্টস্ হচ্ছে আগামী বিস্যুদবার। পারো তো মিনুকে নিয়ে এসো। মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা হবে।"

বিস্যুদবারে ইস্কুল ছিলো বলে আমরা কেউ যেতে পারি নি। আর তা' ছাড়া ছেলেদের স্পোর্টস—সে আর অমন দেখার কি। লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি এই তো!

সন্ধ্যার দিকে পাশের বাড়ীর মেরী আপা এলেন। তিনি স্থানীয় কলেজের ছাত্রী। সবে কলেজ স্পোর্টস থেকে ফিরছেন। স্পোর্টস-এর গল্প করতে করতে বল্লেন, "ফার্স্ট ইয়ারের একটি ছেলে এবার ড্রেস-এজ-ইউ-লাইক-এ ফার্স্ট হলো। ওকে আমরা কেউ ধরতেই পারি নি, ও সত্যিকারের সন্ন্যাসী নয়—একজন ছাত্র। গেইটের পাশে সেই দুপুর থেকে বসে কতোজনের সাথে কতো কথাই না বল্লে। সবচে' মজার ব্যাপার হলো, আমাদের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে দশটি টাকা আদায় করে তবে ছেড়েছে।"

স্পোর্টস কাহিনী শোনে মনে মনে দুঃখিতই হলাম। আপা ভাইয়ের কথামতো গেলেই যেনো ছিলো ভালো। সত্যি, ভালো একটা জিনিস মিস্ করলাম।

মেরী আপা উঠে গেলে আমরাও বই-পত্র নিয়ে যথারীতি বসলাম। দু'বোনে চুপচাপ বসে পড়ছি। দরজাটা ভেজানো। আব্বা-আম্মা সন্ধ্যার পর অসুস্থ খালামাকে দেখতে মোহাম্মদ আলী রোডে গেছেন। ছোট ভাই হীরামণি পাশের কোঠায় পড়ছে। এমন সময় বারান্দায় কে যেনো গম্ভীর গলায় বলে উঠলো: ইয়া আলী, মুশকিল কুশা—

দু'জনেই চমকে উঠি। কে রে!

দরজা খুলতেই দেখি, এক বিরাট সন্ন্যাসী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঘরের ইলেকট্রিক আলো এসে পড়ছে তার মুখে। মাথাভরা জট্, মুখ সর্বস্ব সাদা-কালো দীর্ঘ দাড়ি, গলায়

লাল-নীল পাথরের মালা, হাঁটু ইস্তক লম্বা শুভ্র আলখাল্লা।

আমাদের দেখেই লোকটা বারান্দায় বসে পড়লো।

: দু'টো ভাত দাও তো বোন।

ভাত! ভাত দিই কি করে! মিনুর দিকে প্রশ্নভরা চোখ তুলি। মিনুও আমার দিকে তাকায়। ভাবটা এই, আম্মা বাসায় নেই, ভাত দিই কি করে?

: চুপ করে আছো কেনো?—সন্ন্যাসী আমাদের দিকে সোজা চোখ তুলে আবার বলে।—ভাত নেই, বলতে চাও? হাঃ হাঃ হাঃ।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে। মিনু চুপি চুপি বললে, "তুই একটু দাঁড়া, আমি কিছু পয়সা নিয়ে আস্‌ছি।" এ বলে মিনু পাশের রুমে চলে গেল।

: আচ্ছা বোন, তোমার জন্ম কোন্ মাসে বলতে পারো?—সন্ন্যাসী আমায় জিজ্ঞেস করে।

: শ্রাবণ মাসে—

: ব্যস হয়েছে, আর বলতে হবে না, বুঝেছি।—আমার কথা লুফে নিয়ে বলতে থাকে সন্ন্যাসী।—শ্রাবণ—শ্রাবণ, হ্যাঁ শ্রীমঙ্গলে তোমার জন্ম—তোমার নাম হবে, চিনু।

আমি ততোধিক বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে তাকালাম। আমার অতো কথা জানলো কি করে? নিশ্চয়ই খুব জানে-ওয়ালা, কামেল সন্ন্যাসী।

: এই নিন, চার আনা পয়সা। ভাত দেয়া সম্ভব হবে না।—মিনু এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

: হাঃ হাঃ হাঃ।—উচ্চৈস্বরে হেসে উঠ্‌লো সন্ন্যাসী।—পয়সা? পয়সা আমি চেয়েছি তোমাদের কাছে? এই ছাখো, কাকে বলে পয়সা—। বলে সন্ন্যাসী তার আলখাল্লার ভেতর থেকে মুঠ করে কি যেনো হাত প্রসারিত করলে বারান্দার উপর। দেখি, কতকগুলি একটাকা, পাঁচটাকার নোট।

আমি মিনু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ব্যাপার কি?

: তুমি তো চিনু। আর তুমি—তুমি-- তুমি তুমি নিশ্চয় মিনু।—এ বলেই আবার সেই হাঃ হাঃ অট্টহাসি।

আমরা তো রীতিমতো স্টাণ্ড—নির্বাক, বোবা। নিষ্পলক দেখছি সন্ন্যাসীর সব ভৌতিক কাণ্ড কারখানা। হাসি থামিয়ে সন্ন্যাসী এবার বললে, "চিনু...মিনু.....হ্যাঁ সাবধান, খুব সাবধান। সামনে তোমাদের মস্ত ফাঁড়া দেখছি...খুব সতর্ক থাকতে হবে তোমাদের।"

ফাঁড়া! আমার কেমন জানি ভয় ভয় করতে লাগলো।

বল্লাম: ফাঁড়া? কেমন ফাঁড়ার কথা বলছেন আপনি?

: বড়ো শক্ত ফাঁড়া বোন, সাংঘাতিক ফাঁড়া, এক বিরাট ষড়যন্ত্র। তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাঁওতা দিয়ে তোমাদের বাসা থেকে বার করে নেবে। তারপর তোমাদের—আচ্ছা থাক, আগে একটু পানি দাও তো বোন, গলাটা ভিজিয়ে নিই। সেই দুপুর থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। যাও মিনু, তুমিও যাও—অতিথিকে শুধু পানিই খাওয়াবে?

আমাদের ভবিষ্যৎ ফাঁড়ার কথা শোনার উদগ্র আগ্রহ আমাদের তখন পেয়ে বসেছে। একটু নাস্তা খাইয়ে ফাঁড়ার কথাটা জেনে নিই। যা ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে সন্ন্যাসী। আল্লাই জানেন, কপালে কি আছে।

মিনুর হাতে পানির গ্লাস, আমার হাতে রেকাবী-ভরা কুমড়োর মোরব্বা নিয়ে ঝটপট্ বারান্দায় এসে দেখি, কোথা সন্ন্যাসী; সব যে হাওয়া। সন্ন্যাসী গায়েব।

আমরা দু' বোনের অবাক হবার পালা। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি।

তিন দিন পর আপাভাই-এর চিঠি পেলাম, "তোমাদের আমন্ত্রণ রাখতে পারিনি ভাই, মাফ করো। এবার আমার একটা কথা রাখবে কি? আশা করি বড়ো ভাইয়ের কথার খেলাপ করবে না। একদিন আমাদের বাসায় তোমরা এসো না! ক'দিন ধরে টাইফয়েডে ভুগছি—রোগ ক্রমেই বাড়ছে। বাসা পেতে মোটেই বেগ পাবে না। কলেজ রোড ধরে সোজা পশ্চিমে এগুতে থাকো—নাক বড়াবড় যে বাসাটা পাবে, সেটা হলো ছেচল্লিশ নম্বর বাসা। তার ঠিক লাগা উত্তরের বাড়ীটাই আমাদের। ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের বাসার কথা বললে কানা লোকেও দেখিয়ে দিতে পারবে। এসো একদিন, কেমন? আম্মাও তোমাদের অনেকদিন দেখতে চেয়েছেন, হাজার হোক, মায়ের মন তো!"

আপাভাইয়ের অসুখ-খবরে মন আমার খারাব হয়ে যায়। না, তাকে একবার দেখা উচিত।

মিনু বললো, "না, ও সব আমি বিশ্বাস করি না। অসুখ-বিসুখ সব বানানো কথা। মনে নেই সেই সন্ন্যাসীর কথা? আমি যাবো না, তোর ইচ্ছে হয়, তুই যা।"

সন্ন্যাসীর ফাঁড়ার কথা আমি ভুলি নি। আমার মনেও দ্বিধা এলো। যাবো কি যাবো না। নানা যুক্তির তর্কাতর্কি। অবশেষে মন সিদ্ধান্ত করলো, যে ভাইয়ের সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে না যাওয়াই উচিত।

এক সপ্তাহ পর।

আপাভাই আবার লিখলো, "তোমরা তো বাসায় আর এলে না। আমি হাসপাতালে চলে এসেছি। শরীর খুবই দুর্বল। মৃত্যুর পদধ্বনি যেনো রাতদিন কানে বাজছে। ভয় হচ্ছে বড়ো, যদি মরে যাই। আর যদি শ্যামল ধরণীকে দেখতে না পাই। মরবার আগে আমার প্রীতিস্নিগ্ধ বোন দু'টিকে আবার দেখার বড়ো সাধ হচ্ছে চিনু। একদিন সন্ন্যাসীর বেশে অভিনয় করে এলাম শুধু, কথা তো বলি নি! লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমরা এসো—তোমাদের আপাভাইটিকে প্রথম ও শেষবারের মতোন দেখে যেও।"

হ্যাঁঃ, বলে কি এ সব! সেদিনের সন্ন্যাসী তা' হলে আসল সন্ন্যাসী নয়, আপাভাই নিজে। আর ওদিকে সন্ন্যাসীর কথায় বিশ্বাস করে আমরা আপাভাইয়ের বাসায় গেলাম না! আমরা দু'জনেই নিজেদেরকে খুব তিরস্কার করলাম।

তক্ষুনি ঠিক করলাম, পরশু দিন ইস্কুল ছুটির পর ওখান থেকেই চলে যাবো হাসপাতাল।

বিস্বাদবার দিন।

ইস্কুল থেকে রিকশা করে আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁচেছি, তখন বিকাল পাঁচটা। চার নাম্বার ওয়ার্ডে আটাশ নাম্বার বেড খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও বেডটাই নেই।

কাছে একজন নার্স দেখে বললাম, "এই আটাশ নাম্বারের পেশেণ্ট কোথায়?"

নার্স একটু থেমে বলল, "আটাশ নাম্বার বেড—মানে ম্যানেজার সাহেবের ছেলের কথা বলছেন?"

"হ্যা হ্যা, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের ছেলে—নিসার আলী।"

নার্স এবার গলার স্বর বদলিয়ে বলল, "ও, তিনি তো চলে গেছেন।"

"চলে গেছে! তা বাসায় কি দেশে গেলো বলতে পারেন?"

"ননা, তিনি আজ সকালে মারা গেছেন।"

"মারা গেছে!"—মিনু ও আমার মুখ থেকে সমস্বরে বেরিয়ে এলো, "আপাভাই মরে গেছে?"

তারপর—

তারপর?

তারপর কতো দিন কতো রাত পার হয়ে গেলো। স্মৃতি-বিস্মৃতি নিয়ে জীবনের কতো বছর পার হলো। আজো যদি পথে হঠাৎ কোনো ফকির-সন্ন্যাসী কিসিমের লোক দেখি, দাড়িওয়ালা মানুষ দেখি, থমকে দাঁড়াই। চকিতে মনে পড়ে যায় সেই আপাভাইয়ের কথা—সাথে সাথে চোখ ফেটে কান্না আসে আমার আর মনের গহনে গুমরে উঠে একটা আকুল আর্তনাদ—"আপাভাই, তুমি আমাদের মাফ করো—মাফ করো তোমার অবুঝ বোনটিকে!"

অনশন

॥ বদিয়স সালাম ॥

হরিদাস পাল্লা,
ভাত তিনি খাননা।
রেশনের চাল নাকি,
পেটে তার থাকি থাকি,
করে শুধু গোলমাল;
বলেছেন তাই কাল,
রেশনেতে যাবোনা,
চাল তার খাবোনা,
শুয়ে রব চিৎপাত,
হয়ে যাবে বাজীমাত।
তারপর দেখো কাল,
ফের দেবে দেশী চাল।

সিন্দাবাদ

॥ আবুল হাসান ॥

লাগুক জোয়ার জীবন-হাটে,
সোনার ফসল ফলুক মাঠে।
দুঃখ জড়ার তামস নাশি
সবার মুখে ফুটুক হাসি,
দেশের মাটি জাতির প্রাণ
ধন্য হোক পাকিস্তান।

ধানের শীষে নুপুর বাজুক,
পাটের ক্ষেতে শিহর লাগুক,
কিষাণ বুকে ফুর্তি জাগুক,
মুচকি হাসি উছলে পড়ুক,
সাগর পানি গর্জে মরুক,
দানব রাজা বজ্র হানুক,
নায়ের মাঝি ধরুক তান,
ধন্য হোক পাকিস্তান।

মরা গাঙে জোয়ার জাগে,
নৌকা চলে ঢেউর আগে,
হেলাল নিশান নায়ের পালে,
ধ্রুব তারা দীপ্ত ভালে,
ঝড়-তুফানে নাইরে ডর,
শক্ত হাতে বৈঠা ধর।
পুবের মাঝি দেখবে যেই,
সুর্যি মামা ভাগবে সেই,
হুররে হো সিন্দাবাদ,
পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

॥ শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

লেফ্‌ট রাইট্‌—লেফ্‌ট, খোকা চলেছে যুদ্ধ করতে। সবাই অবাক হয়ে বল্‌ল—"ওমা! একি কাণ্ড! এতটুকু খোকা কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলেছে কোথায়?" রাখাল ছেলে মাঠের ধারে গাছ তলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল। হঠাৎ দূর থেকে খোকাকে বুক ফুলিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবলো—কে আস্‌ছেরে বাবা, মারবে না কি? একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। ওমা—এযে আমাদের খোকা! দিব্যি একেবারে বীরযোদ্ধা সেজেছে দেখছি! তাড়াতাড়ি সম্মুখে এসে বল্‌ল, "বলি ও খোকা! এত সেজেগুজে যাচ্ছ কোথায়?"

খোকা তলোয়ার ঠুকে বল্‌ল, "খবরদার! আমাকে বিরক্ত করো না। আমি যাচ্ছি সাত-সমুদ্র তের নদী পেড়িয়ে অচিন দেশ থেকে পরীদের ধরে আনতে।"

রাখাল অবাক হয়ে বল্‌ল, "ওমা। সে কি কথা গো! তুমি অতটুকু খোকা, তুমি যাবে অচিন দেশে?"

চোখ রাঙিয়ে খোকা বল্‌ল, "দেখ, আমার সাথে ইয়ারকি করো না। জান আমি ভয় করি না। দেশের জন্য যদি মরণকে তুচ্ছ করতেই না পারলাম তবে জীবনই বৃথা।"

রাখাল ভয়ে ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বল্‌ল, "কিন্তু তুমি যে ছোট্ট খোকা।"

"ইস্‌! ছোট্ট আমি দেখতে, কিন্তু মনে আমার দৈত্যের বল। একটা পরী এনে রাখব দাসী করে। সে আমাকে পিঠে করে নিয়ে যাবে সে···ই দূরে। যেখানে মানুষ যেতে পারে না। সেখান থেকে নিয়ে আসব আমি মণি, মুক্তা, চুনী, পান্না। আর তাই দিয়ে দেশের দুঃখ ঘুচাব। যাও, আমার সময় নষ্ট করো না।"

রাখালও এবার এগিয়ে এলো। খোকার বীরত্ব দেখে তার কাছে অনেক মিনতি করে

বলল, "ভাই, আমাকেও তোমার সাথে নাও। তোমার মত বীরের সাথে থেকে যদি একটু দেশের কাজ করতে পারি তবে জীবন ধন্য হবে—তোমাকেও চিরকাল মনে রাখব।"

খোকা একটু ভেবে বলল, "আচ্ছা চল, কিন্তু খবরদার! ভয় যদি পাও তা' হলে আমিই তোমার গলা কেটে ফেলব।"

রাখাল হাত জোর করে বলল, "আমাকে একবার নিয়েই দেখ না সঙ্গে করে। আমি যদি সত্যি সত্যি সাহসী আর বীর না হই আমাকে তাড়িয়ে দিও।"

খোকা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, "সাবাস, এই ত আমি চাই।"

দু'জনে চলল পাহাড়ের ধারের বনের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ দূরে শোনা যেতে লাগল একটা ভীষণ শব্দ। কারা যেন বাড়ীঘর গাছগরান ভেঙে ধ্বংস করতে করতে আসছে।

পাখীরা সব ভয়ে চীৎকার করে বাসা ছেড়ে আকাশে উড়তে লাগল। জঙ্গলের যত পশু প্রাণের ভয়ে ছুটছে আর ছুটছে। রাখালও ঘাবড়ে গেল। খোকাকে বলল, "খোকা, ব্যাপার ত সুবিধের নয়। চল আমরা পাহাড়ের ঐ গুহায় লুকিয়ে পড়ি।"

খোকা বিরক্তির সাথে বলল, "এইজন্যেই আমি প্রথম থেকে তোমাকে আমার সাথে আসতে মানা করেছিলাম। পালাতে হয় তুমি পালাও, আমি পাকিস্তানের বীর মুজাহিদ, আমি কাউকেই ডরাই না।"

রাখাল বলল, "আহা! তোমার সাথে আর পারা গেল না, একটুতেই চটে ওঠ। তোমরা ছেলে মানুষ; জোর তোমাদের থাকতে পারে; কিন্তু বুদ্ধি তোমাদের কম। তুমি আর ক'দিন হ'ল এই দুনিয়া দেখছ? আমি দেখছি তোমার চাইতে দশগুণ সময় আগে থেকে। একটা হাতীর গায়ে খুব জোর আছে, কিন্তু সে যদি দুঃসাহস করে প্রবল জলের বেগকে রুখতে যায়, সে ভেসে যাবে। এটা হাতীর সাহসের পরিচয় হবে না, এটা হবে তার গোয়ার্তুমি।"

খোকা বলল, "তবে কি করতে বল তুমি?"

রাখাল ব্যস্তভাবে বলল, "আর একটুও দেরী ক'র না, এস আমরা লুকিয়ে পড়ি। হয়ত আমরা বেঁচে থাকলে এই আপদকে ধ্বংসও করতে পারব।"

বলেই সে খোকার হাত ধরে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে পড়ল।

ওরে বাবা, একটু বাদেই ছুটে এল একটা প্রকাণ্ড দৈত্য। হাতে তার একটা গদা। গদা দিয়ে যাকে কাছে পাচ্ছে তারই মাথাটা গুঁড়ো করে দিচ্ছে। আর রাগে পা দিয়ে চেপে আস্ত আস্ত বিরাট গাছগুলোকে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে।

গুহার মধ্যে লুকিয়ে খোকা আর রাখাল দৈত্যের কাণ্ড দেখছে। দৈত্য সব ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে চলেছে। অনেকটা এগিয়ে গেছে সে—এবারই হয়ত লোকালয়ে ঢুকে পড়ে নিরীহ অধিবাসীদের শেষ করবে। এমনি সময় দেখে তারা একটি লোক সমস্ত গায়ে গাছের ডালপালা বেঁধে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছেন দৈত্যের পিছনে পিছনে। তাকে দেখেই খোকা আর রাখাল ছুটে এল। খোকা লোকটিকে বল্‌ল, "আপনি বুড়ো মানুষ, কোথায় যাচ্ছেন ওদিকে ?"

বুড়ো বললেন, "দৈত্যটাকে মারার জন্য একজন সাহসী লোক খুঁজছি।"

খোকা লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, "আমাকে বলুন কি করতে হবে।"

বুড়ো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "তোমার সাহস ত কম নয় হে! কিন্তু যে কাজ করতে হবে তা কি পারবে ?"

খোকা বল্‌ল, "বলেই দেখুন না।"

বুড়ো বলতে লাগলেন, "ঐ যে দৈত্যটা দেখছ, অসীম ওর বল। কিন্তু যে ওকে আগে আঘাত করতে পারবে তার কাছে ও হেরে যাবে। কিন্তু দৈত্যের ভীষণ চেহারা দেখে কেউই স্থির থাকতে পারে না—হারিয়ে ফেলে নিজের সত্ত্বা। তখন দৈত্য তার মুগুড় দিয়ে আততায়ীর মাথাটা গুঁড়ো করে দেয়।"

খোকা বল্‌ল, "আপনি কিছু ভাব্‌বেন না, এখানে দাঁড়িয়ে দেখুন আমি ওর কি করি।" —বলেই ছুটে চল্‌ল দৈত্যের দিকে।

কাছে গিয়েই তলোয়ার খুলে ভীমগর্জনে দৈত্যকে ডেকে বল্‌ল, "এই দৈত্য, এদিকে আয়। আজ আমি তোর শক্তি পরীক্ষা করব।"

দৈত্য চম্‌কে গেল। কা'র এমন ক্ষমতা যে তাকে ডাকে! পিছনে ফিরে খোকাকে দেখেই বিকট হাঁ করে বড় বড় দাঁত আর জিব বের করে গদা উঠিয়ে মারতে এল খোকাকে। খোকা একটুও ভয় পেল না। তলোয়ার দিয়ে এক কোপ লাগিয়ে দিল দৈত্যের বাঁ হাতে। তলোয়ার হাতের মধ্যে বসে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটল রক্ত। দৈত্যের হাত থেকে গদা পড়ে গেল। সে কাতরভাবে লুটিয়ে পড়ল খোকার পায়ে। কেঁদে বল্‌ল, "কে তুমি ? কত বীর আমার হুংকারেই নিজেদের প্রাণ হারিয়েছে; আর এতটুকু ছেলে তুমি আজ আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছ। আমার আর কোন ক্ষমতা নাই। তুমি এখনই আমাকে মেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু একটু থাম। আমি শেষ মুহূর্তে একটু উপাসনা করে নেই। জীবনে কখনও ভগবানকে ডাকিনি। মনে করতাম আমি ভগবানের চেয়েও বড়, কেন তাকে ডাকব ? আজ তোমার কাছে আমার সকল গর্ব খর্ব হয়েছে।"

দৈত্যের কথায় খোকার খুব দয়া হ'লো। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে তার হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল। তারপর জল দিয়ে ভিজিয়ে দিল। খোকার সেবায় দৈত্যের বেদনা গেল সেরে। খোকা দৈত্যকে বল্‌ল, "আমি তোমাকে মারব না, কিন্তু তুমি জগতে কারো আর অনিষ্ট করবে না এই কথা আমাকে দাও।"

দৈত্য বল্‌ল, "খোকা! আমি তোমার অবাধ্য হ'ব না, আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না; ছায়ার মত থাকব তোমার সাথে সাথে; তুমি যা বলবে তাই আমি করব। আমার অসাধ্য কিছু নাই।"

রাখাল আর বুড়ো এগিয়ে এসেছে খোকার কাছে। বুড়ো বললেন, "সত্যি খোকা, তোমার মত ছেলে যদি আমাদের দেশে থাকে তবে আমাদের স্বাধীনতা চিরকাল অটুট থাকবে।"

রাখাল বল্‌ল, "খোকা! এবার আর তোমার চিন্তা নাই। দৈত্যকে সাথে করে নিয়ে যাও, সেই তোমাকে পরীদের ধরে এনে দেবে।"

খোকা দৈত্যকে বল্‌ল, "তুমি আমাকে পরীদের দেশে নিয়ে চল।"

বলার সাথে সাথে দৈত্য খোকাকে কাঁধে করে সাঁ করে আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

নিশুতি রাত। পরীদের দেশে সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। দৈত্যের বিকট গর্জনে হঠাৎ সকলে ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। পরীদের রাণী খাটের উপর উঠে সম্মুখে দৈত্য আর ছোট্ট খোকাকে দেখে হক্‌চকিয়ে গেল। খোকা গম্ভীরভাবে বলল, "রাণী! আমি তোমার কোন অনিষ্ট করতে চাই না। তোমাকে একটি পরী দিতে হবে আমার দেশের জন্য, সে আমার দেশের সকল জিনিস এনে দেবে।"

রাণী উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোর করে বল্‌ল, "আমার এখানে সাধারণ লোক কেউ আসতে পারে না। আমাদের এখানে যারা সশরীরে আসতে পারে তাদের কথা আমাদের শুনতেই হয়।"

—বলেই সে একটি পরীকে ডেকে এনে খোকাকে দিয়ে বল্‌ল, "নিয়ে যাও একে তুমি, তোমার দেশের সকল কল্যাণ এ করবে।"

খোকা দৈত্যের কাঁধে উঠে বসল। দৈত্য ছুট্‌ল আকাশ দিয়ে। পরী তাদের রাণীকে অভিবাদন করে খোকার পিছনে পিছনে চলল।

রাখাল মাঠের ধারের গাছতলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে খোকার প্রতীক্ষায়। দূর থেকে দৈত্যের কাঁধে খোকাকে দেখে আনন্দে হাত তুলে ইশারা করতে

লাগল। দেখতে দেখতে খোকা এসে জন্ম-ভূমিতে নামল, পিছনে তার ফুট্‌ফুটে পরী তার সোনালী ডানা দু'টো গুটিয়ে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছে। রাখাল খোকাকে আনন্দে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল।

খোকা বলল, "নাও ভাই, আজ স্বাধীনতার দিনে দেশের জন্য এই উপহার এনে দিলাম আমি তোমাদের। যা কিছুর প্রয়োজন হবে শুধু হুকুম করবে একে, এ তোমাদের সব অভাব মিটাবে। দৈত্য ভাই! তোমার এখন ছুটি, যখন আমি তোমাকে আবার স্মরণ করব তখন তুমি আসবে।"

—বলে বুক ফুলিয়ে তালে তালে পা ঝুলিয়ে খোকা বাড়ী ফিরে চলল।

জাগরণ

॥ আস্‌মা চৌধুরী ॥

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা,
সকাল বেলা করছিলো সে খেলা।
সোনার বরণ রোদটুকু ঝিলমিলিয়ে গেলো,
বললো—ওগো প্রভাতপাখী, এবার নয়ন মেলো।
ভোর হয়েছে শিউলিতলে ঝড়ছে কত ফুল,
পূবাল হাওয়া থেকে থেকে দিচ্ছে দোদুল দুল।
খুকু সোনা ওই যে দেখো জড়ানো চোখ খুলে,
তারই সাথে খোকাবাবু ডাগর আঁখি মেলে।
ফুলপরীরা হেসে হেসে কয় যে কতো কথা,
ঠিক যেনো এক বিনে-সুতোয় ফুলের মালা গাঁথা।
পাখীরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে চললো গগন পানে,
সারা ভুবন ভরে গেলো কাহার হাসি গানে!

আষাঢ়ের বৃষ্টি

॥ কাজী হাসান আমিন ॥

●

এই নব আষাঢ়ে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি,
মাঝে মাঝে আকাশে, আগুনের দৃষ্টি।
থৈ থৈ মাঠ-ঘাট—ভরে' সব খাল-বিল্।
বয়ে চলে ভরা নদী, হাসে যেন খিল্‌খিল্।

ছাতা মাথে লোকজন সব ছোটে চারদিক্,
শুধু থাকে গাছগুলি ; যেন ওরা নির্ভীক।
পাখী সব ছোটে ঐ নিজ নিজ বাসাতে,
ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, সব পারে ভাসাতে।

কক্‌কড়্ বজ্র—পড়ে বুঝি ঐ রে !
ঘাটে, মেয়ে বলে ভয়ে, চল্ ভাই সইরে !'
মেঘ ভরা আকাশে—পড়ে শুধু বৃষ্টি,
পথ-ঘাট, কাদা ভরা, একি অনাসৃষ্টি !

বৃষ্টি হ'লে শেষ—চারদিক্ নির্মল,
সাঁজের ছায়ায় দেখি সব ঐ ঝল্‌মল্।
'কেয়াফুল,' 'কদম্ব' আর 'বেলীর' বাসে,
সুবাসিত করে, এই আষাঢ়ের মাসে।

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন

॥ আবু হেনা ॥

"ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড" বইখানা তোমরা পড়েছ? বইখানি ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'dissociation of personality' বা একাধিক ব্যক্তিত্ববোধ তারই একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। কথাটা একটু খোলাসা করেই বলা যাক।

সাধারণতঃ মানুষের মানসিক অবস্থার সমস্ত পর্যায়ে তার ব্যক্তিত্ব একই থাকে। 'ব্যক্তিত্ব' অর্থে এখানে বিশেষ কোন গুণ নয়। আমরা সাধারণতঃ তাঁকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক বলি যিনি সব সময় গম্ভীর থাকেন, যাঁর সামনে এলে আপনা থেকেই মাথা অবনত হয়ে যায় কিংবা আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ব্যক্তিত্ব শব্দটার অর্থ এখানে, কোন ব্যক্তির সমস্ত গুণের সমন্বয়। আরো পরিষ্কার করে বল্‌তে গেলে, কোন মানুষের মানবিক সমস্ত গুণের যোগফল হলো সেই মানুষের ব্যক্তিত্ব। যাক্, যা বল্‌ছিলাম। মানসিকতার সমস্ত স্তরে ব্যক্তিত্ব একই থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় এমন দেখা যায়, কোন মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ব্যক্তিত্বও বিভিন্ন রূপ নেয়। যেমন ধর "ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইডের" ব্যাপার। তোমরা যারা বইখানা পড়েছ তারা নিশ্চয়ই জান ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইড আদতে দুইজন লোক নয়, একজন লোকই। দিনের বেলায় যে লোক (ডাঃ জেকিল) ভদ্র, শান্ত, পরদুঃখকাতর, রাতের বেলায় সেই একই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর, দানবতুল্য, নররক্তপিপাসু। দিনের বেলায় যিনি দয়া, মায়া, মমতায় বিগলিতপ্রাণ, রাতের বেলায় তিনি নির্মম, নৃশংস, হত্যার নেশায় সর্বক্ষণ অস্থির ও উত্তেজিত। বুঝতে পারা যায় না এমন নিরীহ, শান্ত ব্যক্তির মধ্যে কেমন ক'রে লুকিয়ে থাকতে পারে মিঃ হাইডের রক্তপিপাসু চণ্ডমূর্তি। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসতেই ডাঃ জেকিল কিছুতেই সংবরণ করতে পারেন না নিজেকে। অবচেতন মনে ক্রিয়াশীল ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর মিঃ হাইডের মূর্তিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। যাহোক, বড় হয়ে এ দ্বৈত ব্যক্তিত্বের বিষয়ে তোমরা অনেক কিছু জান্‌তে পারবে।

এমন একটি বিস্ময়কর পুস্তকের রচয়িতা কে, জান? তিনি হচ্ছেন সাহিত্যক্ষেত্রে এক কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন।

ষ্টিভেনসন স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ শহরে ১৮৫০ সালের ১৩ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য যাচ্ছেতাই

খারাপ ছিল। খারাপ স্বাস্থ্য সাধারণতঃ মনকেও প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু সেদিক্ দিয়ে ষ্টিভেনসন ছিলেন ব্যতিক্রম। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব স্ফূর্তিবাজ আর প্রাণবন্ত। অদ্ভুত প্রাণশক্তি ছিল তাঁর। স্কটল্যাণ্ডের কত উপকথা, রূপকথাই না রুদ্ধনিঃশ্বাসে তিনি শুনতেন ছেলেবেলায়। মন তাঁর সাথে সাথে চলে যেত কল্পনার ডানা মেলে কল্পলোকে। জীবনভরই ষ্টিভেনসনকে খারাপ স্বাস্থ্যের বোঝা বইতে হয়েছে। ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না।

রবার্টের বাপ মা স্বপ্ন দেখতেন তাদের ছেলে লণ্ডন বারে আইন ব্যবসা করবে। তাই রবার্টকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হ'ল। গ্রাজুয়েট হবার পর এই তরুণ আইনের ছাত্রটি হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তার উপদেশ দিলেন বায়ু পরিবর্তনের। ষ্টিভেনসন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভ্রমণে বহির্গত হলেন।

বয়স তাঁর তখন ২৯ বৎসর। ষ্টিভেনসনকে এবারও স্বাস্থ্যের কারণেই যেতে হ'ল আমেরিকাতে। পশ্চিমে মণ্টারী, কালিফোর্নিয়ার শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করতে লাগলেন। হঠাৎ ঐদিকের এক মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একদিন ষ্টিভেনসন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। একে তো স্বাস্থ্য খারাপ, তার উপর মরুভূমির অসহ্য উত্তাপ সহ্য করতে পারলেন না ষ্টিভেনসন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দু'রাত তিনি পড়ে রইলেন মরুভূমির সেই বালুসমুদ্রের মধ্যে। হয়ত তিনি মারাই যেতেন যদি দু'জন ছাগলরক্ষক সীমান্তবাসীর চোখে তিনি না পড়তেন। তারা তাঁকে বহন করে তাদের কুটীরে নিয়ে গেল। তাদের প্রাণঢালা সেবাশুশ্রূষায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ষ্টিভেনসন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বিদায় নিয়ে অদম্য উৎসাহে আবার পথের আহ্বানে বেরিয়ে পড়লেন ষ্টিভেনসন।

পর বছর ষ্টিভেনসন সানফ্রান্সিস্কোতে তাঁর এক পুরানো বান্ধবী ফ্যানী ভ্যান ডি গ্রিফটের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ফ্যানী কিন্তু ছিলেন বিধবা এবং পূর্ব স্বামীর এক ছেলেও ছিল তাঁর। ছেলেটির নাম ছিল লয়েড। ষ্টিভেনসন লয়েডকে স্নেহ করতেন খুব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকে দেশবিদেশের নানান গল্প, রূপকথা শোনাতে এতটুকু শ্রান্তি অনুভব করতেন না। এক সন্ধ্যায় ষ্টিভেনসন একটা বিরাট মানচিত্র এঁকে জলদস্যু, গুপ্তধন, জাহাজডুবি, বিদ্রোহ নিয়ে এক রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদে শোনাতে বসলেন ছেলেকে। লয়েড গল্পের শেষ অবধি রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনে তার সতাত বাপের স্নেহোজ্জ্বল মুখের পানে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, এমন একটা চমৎকার গল্প

লিখে ফেলেন না কেন?" ছেলের অনুরোধে এইভাবে জন্ম নিল ষ্টিভেনসনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'—জিম হকিন্স, ডাঃ লিভ্‌সে আর জন সিলভারের দুঃসাহসিক, রোমহর্ষক কাহিনী।

ষ্টিভেনসন যদি অন্য কোন বই না লিখতেন, তবে একমাত্র এই 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'ই সাহিত্যজগতে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখত। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' প্রকাশের কয়েক বছর পর প্রকাশিত হ'ল ষ্টিভেনসনের সুবিখ্যাত "ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড" যে বই-খানার কথা পূর্বেই বলেছি। এরপর বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর আরেকটি অবদান "কিড্‌ন্যাপ্‌ড" আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সমালোচকের মতে এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ বই।

ষ্টিভেনসনের বয়স তখন সাঁইত্রিশ। স্ত্রীর সাথে আমেরিকা যাত্রা করলেন আবার ইংল্যাণ্ড ছেড়ে। আডিরনডাক পর্বতমালার পাদদেশে সারানাক হ্রদের ধারে একটি শীত কাটালেন স্বাস্থ্যের উন্নতির কামনায়।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ষ্টিভেনসন সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানকার অধিবাসীদের সাথে তাঁর প্রগাঢ় সখ্যতা জন্মে। তারা তাঁর নাম দিয়েছিল 'তুসিতালা'। শব্দটার অর্থ হ'ল কথক বা গাল্পিক। তারা তাঁকে একটি গোষ্ঠির নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করে। এদের জীবন নিয়ে তিনি অনেক কাহিনী রচনা করেছেন। এদের প্রতি তাঁর দরদ আর ভালবাসা ছিল গভীর।

৪৪ বৎসর বয়সে জন্মদিন উদযাপনের সপ্তাহ তিনেক পরে বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢ'লে পড়েন। সারা জীবন ধরে যে পীড়ার সাথে সংগ্রাম ক'রে আসছিলেন তাতে তাঁর জীবনাবসান হয়নি, হয়েছে অতর্কিতে সন্ন্যাস রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে।

ঐ দ্বীপের অধিবাসীরাই পর্বতের শীর্ষদেশে তাঁর কবর দেয়। তাঁরই শেষ ইচ্ছানুযায়ী কবরের উপর স্মৃতিফলকে ষ্টিভেনসনের রচিত কয়েকটি কবিতার চরণ উৎকীর্ণ করা হয়:

বিস্তীর্ণ, তারকাখচিত এই আকাশের তলায়
কবর দিও আমার। ঘুমিয়ে থাকব
আমি চিরদিন সেথায়।
আনন্দে জীবন আমি কাটিয়ে গেলাম;
আনন্দের মাঝেই
যেন আমার জীবনান্ত হয়।
শেষ ইচ্ছা শুধু একটি জানিয়ে যাই—
কবরের গায়ে খোদাই করে দিও এই চরণটি:
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে সে এই স্থানে
জীবনে কামনা ছিল যার থাকতে এই খানে।

একটি কবর

॥ দিলআরা মিনু ॥

পুকুর ধারে একটি কবর
কে জানে ভাই কার—
মাটির মায়ায় ঘুমিয়ে কেবা,
একটু স্মৃতি তার।
পুকুর ঘাটে অনেক সিঁড়ি
শান-বাঁধানো ঘাট—
ছড়িয়ে গেছে মিঠালী রোদ
ফাট্‌ছেনা ভাই কাঠ।
এক পাশে ভাই ছোট্ট কবর,
করবী আর কুল,
সেই কবরে ঘুমিয়ে আছে
আধফোটা এক ফুল।
শুনেছিলাম দিঘীর ঘাটে
শান্ত শীতল জলে
লুকিয়ে গেছে ছোট্ট ছেলে
ঘুমিয়ে পড়ার ছলে।
শ্বেত করবী ফুট্‌বে গাছে
পাক্‌বে ডাঁসা কুল,
ফুটবে না আর এই ঘাটেতে
ছোট্ট ঝরা ফুল।
জাগবে না আর ঘুমের ছেলে
মেলবে না আর আঁখি—
এই কবরে মাটির মায়ায়
তাই বেঁধেছে রাখি।
এদিন যাবে রাত্রি হবে
আসবে নতুন দিন,
হারিয়ে গেল সোনার ছেলে
রইলো না তার চিন্।

রহস্যের অন্তরালে

॥ ভগদত্ত খীলা ॥

১৯৩৯ সাল। জার্মানীর সঙ্গে মিত্র-পক্ষের যুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সে সময়ে অক্টোবরের এক থমথমে কালো রাত নেমে এল বৃটিশ নৌ-জাহাজের আড্ডা স্ক্যাফা ফ্লো'তে। এর দু'দিকে স্থলভাগ, আর বাকী দু'দিকে প্রণালীর মত সমুদ্র যোগাযোগ রেখেছে বহিঃসমুদ্রের সাথে। শান্ত-নীল জল। ছোট ছোট তরঙ্গ-দোলায় নাচছে ছোট-বড় অনেক রণতরী। চাপ চাপ অন্ধকারের বুকে যেন এক একটি দৈত্য!

অগভীর সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মৃত্যু-দূত। কেউ জানল না সে খবর। এগিয়ে এল কাছে···আরো কাছে। সহসা জলের উপর ভেসে উঠল পেরিস্কোপ। শত্রুবাহিনী দেখল বৃটিশ রণপোত 'রয়েল ওক' দুলছে তরঙ্গ-দোলায়, ওটাই তাদের লক্ষ্য-বস্তু। ··একটুখানি হিসেব-পত্র, সামান্য কর্ম-ব্যস্ততা। ...তারপর ছুটল দু'টি টর্পেডো পর পর!··· মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড।··জাহাজটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। 'আগুন লেগে চারিদিক্ ভরে গেল কালো ধোঁয়ায়। বার শ' নাবিকের মধ্যে রক্ষা পেল মাত্র চার শ' জন। বাকী সবাই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেল।

খবর শুনে সবার চক্ষু চড়ক গাছ। এমন সুরক্ষিত নৌ-ঘাঁটি; আর এমন অসাধ্য কর্মের সংঘটন যারা করল, তারা দেবতা না জানি! সবাই ভেবে আকুল। জাহাজে রয়েছে বড় আটটি কামান, পার্শ্বদেশ তের ইঞ্চি পুরু আর ডেক এক ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতে মোড়া। রক্ষা ব্যবস্থার কোথাও ত্রুটি নেই। বলতে গেলে একটা দুর্গ বিশেষ। আর সেই জাহাজের কিনা এমন দুরবস্থা!

ধীরে ধীরে সত্য ঘটনার যবনিকা উন্মোচন হল। যেমন চিত্তাকর্ষক সেই কাহিনী, তেমন চমকপ্রদ। সেই গল্পটাই আজ তোমাদের বলব।

সবাই জানত কোন এক সাবমেরিনের কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন গুন্থের প্রিয়েন করেছে এই অসাধ্য সাধন। সরকারী কাগজ-পত্রেও তার নাম। প্রশংসা, অভিনন্দন সবই জুটেছে তার কপালে। আসলে ক্যাপ্টেন প্রিয়েন এর জন্য দায়ী ছিল না। জাহাজ-ডুবির ব্যাপারে যার কারসাজি ছিল তার নাম আলফ্রেড ভেরিং ওরফে আলফ্রেড ওর্টেল। জন-সমক্ষে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি কোন সময়। যুদ্ধ শেষ

ওয়ার অনেক পরে বিস্তর তদ্বিরের পর জানা গেছে সে খবর।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুদীর্ঘ ষোল বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে ভেরিংকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান-নৌ-বাহিনীতে সে কাজ করত। গোলন্দাজ হিসাবে যেমন ওস্তাদ, নৌচালনায়ও তেমনি তার অসামান্য দক্ষতা। আবার নৌ-নির্মাণ বিদ্যায় একজন কেষ্টু-বিষ্টুও বটে! স্পেনে সে কিছুদিন নৌ-দপ্তরের এটাচি ছিল। তখন ওয়ালটার ভিলহেল্‌ম ক্যানারিসের অধীনে তাকে চাকরী করতে হয়। এই হের ক্যানারিস পরে নাৎসী গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান হন। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর জার্মানী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাতে থাকে। এ সময় জার্মানীর গুপ্তচর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভেরিংও তাদের একজন।

ক্যানারির নির্দেশ হল ভেরিং যেন স্থায়ি-ভাবে বৃটেনে বসবাস করে। সেখান থেকে খবর পাঠাতে হবে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর। প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমে সে সুই-জারল্যাণ্ড যাত্রা করল। তিন বছর শিক্ষা-নবিশির পর ঘড়ির পাকা কারিগর হয়ে পড়ল সে। নূতন নাম নিল আলফ্রেড্‌ ওর্টেল। তারপর পাসপোর্ট জাল করে ১৯২৭ সালে বৃটেন এসে পৌঁছল।

আলফ্রেড্‌ ওর্টেলের মত সহৃদয় বন্ধু বুঝি আর হয় না আলাপে, ব্যবহারে তার জুড়ি মেলা ভার। কথায় কথায় বলে, "বুঝলেন মশায়, নীল সমুদ্র আমাকে যেন সর্বক্ষণ হাত-ছানি দেয়। কিছুতেই সমুদ্রোপকূল ছাড়তে পারলাম না তাই। তার বুকের উপর দিয়ে যখন বাণিজ্য-পোতগুলো দুলতে দুলতে যায় সে আর কি বলব! কল্পনা করতেও আরাম। দেখে শুনে চক্ষু সার্থক করব বলে তাই ওর্কনি দ্বীপের কার্কওয়ালে এসে ডেরা বাঁধলাম। নেশা, মশায় নেশা!..."

তার সরলতায় আর কবিত্বে মুগ্ধ হয় সবাই। সত্যি, জাহাজ আর নীল-সমুদ্রের জন্য কার্ক-ওয়ালের একটা খ্যাতি আছে। কাছেই স্ক্যাফা ফ্লো—বৃটিশ নৌ-বাহিনীর বিখ্যাত আড্ডা।

দু'দিনেই তার আসর হল জম-জমাট। ব্যবসায় বেশ উন্নতি হতে লাগল। লোকজনের বিশ্বাসও বেড়ে গেল তার উপর। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছে প্রায়ই তার তলব পড়ত। ঘড়ি মেরামত করতে হয় সেখানে।

যখনই অবসর হত, তখনই ওর্টেল দৌড় মারবে মাছ ধরতে। পাল তোলা নৌকায় সারাদিন ছিপ হাতে বসে থাকত শান্ত নীল সাগরের উপর। কোন সময় বা মনের আনন্দে নৌকায় পাল তুলে তর তর করে ভেসে

বেড়ায়। সমুদ্রের খাড়ির আনাচে কানাচে, তার গতিবিধি কোথাও বাধা মানত না। বছর কয়েকের মধ্যে উপকূল ভাগের কোন অংশই তার অজানা রইল না।

তাকে দেখে লোকে হাসত। সারাদিন ঘুর ঘুর করা একটা নাকি নেশা! ছো! আস্ত পাগল। তার কথা আলোচনা করে লোকে বেশ আমোদ পেত।

কাজের সুবিধার জন্য ১৯৩২ সালে বৃটিশ নাগরিক হয়ে পড়ল সে।

দিনের পর দিন যায়। বছর গড়ায় তারপর। সমুদ্রের প্রতি ঔৎসুক্যের শেষ নেই ওর্টেলের। চুলেও পাক ধরে এল বলে। তবু বলে, "নেশা, মশায়, নেশা। সমুদ্র আমাকে হাতছানি দিয়েছে। কথা বলি তার সময় কই?"

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

দারুণ জাতীয়তাবাদী আলফ্রেড ওর্টেল। দোকানের সামনে টাঙিয়ে দিল "ইউনিয়ন জ্যাক"—বৃটিশ পতাকা। ক্ষোভে-দুঃখে মুষড়ে পড়ল যুদ্ধের খবর শুনে। আর সকলের মত নিজের সঞ্চিত অর্থ উজাড় করে 'সেভিং বণ্ড' কিনে ফেলল। যুদ্ধে টাকা দরকার। বন্ধু-বান্ধবের কাছে বলত, "বুঝলে কি না, বয়সটা একটু বেশী হয়েছে, না হলে হিটলারকে দেখে নিতাম একহাত।" সঙ্গে সঙ্গে রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠত তার। পাগলার কাণ্ড দেখে হাসত সবাই।

সাময়িকী, সংবাদপত্র ইত্যাদি নিয়মিত পড়ে খবর রাখত সে। রেডিওতে শুনত যুদ্ধের লম্বা লম্বা ফিরিস্তি। আর খবর রাখত জাহাজের।

নৌ-ঘাঁটিতে তখন শুরু হয়েছে কর্মব্যস্ততা। ঘাঁটিতে প্রবেশ করার দু'টি পথ—পূর্বে ও পশ্চিমে। সেগুলো এমনি তে সরু, তদুপরি চোরা মাইন, লোহার জাল ইত্যাদি দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ভিতরে নির্ভয়ে চলা ফেরা করে রণতরীগুলো।

দিন এসে গেছে ওর্টেলের। সেই ষোল বছর আগে হের ক্যানারিস হুকুমজারী করেছিলেন তার উপর। এবারে তা' তামিল করতে হবে। একদিন জানতে পারল পূর্ব-দিকের প্রবেশ পথে কতিপয় মাইন ও লোহার জাল সারানো হয়েছে। বৃটিশ নৌ-দপ্তরের খুব কম লোকেই যে খবর জানত, কি করে সে খবর ওর্টেল সংগ্রহ করল কেউ জানে না সে কথা।

আর দেরী নয়, কিল্লা ফতে। আজই শেষ করতে হবে সবকিছু। তারপর আর কেউ খুঁজে পাবে না কার্কওয়ালের খেয়ালী পাগল আলফ্রেড ওর্টেলকে। আকাশে মেঘ জমছে।

ত্রে ঝড় উঠবে নিশ্চয়। সহকারীকে বলল, হে, সন্ধেটা সুবিধাজনক নয় মোটেই। ঝড় বে। ঝড়ো-দিনে কে আর আসবে। দু'চার খদ্দের যদিই বা আসে, সেটা তুমি সামলিয়ে ও। আমি চললাম।"

ঘরের ভিতর আগুন জ্বেলে আরামে বসল টল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ঘড়ির কাঁটা র চলেছে দ্রুত। গ্রীণ উইচ সময় চারটা ত না হতে এক রেডিও-সেট খুলে বসল সে। র্তে সজীব হয়ে উঠল যন্ত্রটি। সাঙ্কেতিক ষায় দ্রুত বার্তা-বিনিময় চলল দূরের এক ানা জনের সাথে। হেড-কোয়ার্টারে সে র পৌঁছতে বিলম্ব হল না। তৎক্ষণাৎ নতে চাইল হের ক্যানারিস—উত্তর সাগরের র্মান সাবমেরিন কোথায় আছে। কার্ক-ালের সর্বাপেক্ষা কাছে আছে কে? জানা ল, ক্যাপ্টেন গুন্থের প্রিয়েনের পরিচালনায় —০৬' রয়েছে সর্বাপেক্ষা কাছে। হের ানারিসের আদেশ গেল সাঙ্কেতিক ভাষায়।

কার্কওয়ালের কাছে এসে ভেসে উঠল মেরিন। চারিদিকে ঝড়ো হাওয়া। আকাশে ব। কোথায় সেই আলোর সঙ্কেত। কূলে ন ওর্টেল আলো দেখাবে তাদের। সহসা টমিটে শিখা জ্বলে উঠল তিনবার। ওর্টেল সছে। জাহাজে তোলা হল তাকে। রপর 'বি—০৬' আবার ডুব মারল সাগরের লে।

এবার জাহাজ পরিচালনার ভার নিল র্টেল নিজে। এ অঞ্চলের সবটাই তার জানা। ই কাগজে নকশা করে রেখেছে সে।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলে 'বি—০৬'। গমন পথে অসংখ্য মাইন আর লোহার জাল। তাই চলতে হয় সাপের মত এঁকে-বেঁকে। ততক্ষণে প্রিয়েন আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে নিল।

বিপদসঙ্কুল পথ। ওর্টেলের পক্ষেও বেগ পেতে হল বেশ। চারিদিকে মাইন। এই বুঝি একটা ফেটে গেল। এক ইঞ্চির জন্য বেঁচে যায়। কোন সময় বা তলদেশে ধাক্কা লাগে বুঝি!

অবশেষে অশেষ চেষ্টায় প্রশস্ত স্থানে পৌঁছা গেল। এবার ভালয় ভালয় কাজ শেষ করে ফিরে যেতে পারলে হল। পেরিস্‌কোপ ভাসিয়ে দেওয়া হল উপরে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা হল চারিদিকে। সর্বত্র জাহাজ আর জাহাজ। ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার, ব্যাটলশিপ। দৈত্যের মত সবাই দাঁড়িয়ে। আরো মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে 'বি—০৬'। এবারে ডাক পড়ল ওর্টেলের। সে চিনে নিক কোন্‌টা 'রয়েল ওক,' যার জন্য সাধনা করতে হল ষোল বছর।

এক নজর দেখেই ওর্টেল চিনে ফেলল। ওই ত দেখা যাচ্ছে নঙর করা 'রয়েল ওক'।

সবাই আনন্দে আত্মহারা। ক্যাপ্টেন প্রিয়েন খুশীর ধমকে ফেটে পড়ে আর কি! হুকুমজারী হল টর্পেডোগুলো যেন ঠিক-ঠাক রাখা হয়। ইতিমধ্যে ধীরে এগিয়ে চলল 'বি—০৬' সুবিধাজনক স্থানে। এবারে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল 'রয়েল ওক'। উত্তেজনায় আর সাফল্যের সম্ভাবনায় ওর্টেল কাঁপছে। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হল ইঞ্জিন। নীরব সমুদ্র-তল।

শেষ বারের মত একবার পরীক্ষা করে দেখা হল টর্পেডোগুলো। তারপর ছেড়ে দেওয়া হল পর পর দু'টো। মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড! নারকীয় বীভৎস তাণ্ডব।...

আবার কলকব্জা সচল হয়ে উঠল "বি—০৬"-এর। পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলল এবার। আত্মরক্ষার তাগিদ এসেছে। কোন রকমে পালাতে পারলে এ যাত্রার মত রক্ষা!

বহিঃসমুদ্রে এসে তাদের আনন্দ আর ধরে না। সবাই ভুলে গেল সৈনিকোচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা। বোতলের পর বোতল মদ উজার হল। সবাই নাচতে লাগল ধেই ধেই করে।

কীয়েলের এক বন্দরে নেমে গেল আলফ্রেড ওর্টেল। ছদ্মনাম বদল করে আবার নিজের নাম রাখল আলফ্রেড ভেরিং।

এদিকে বন্দরে ক্যাপ্টেন প্রিয়েনের সম্মানার্থে কত কিসের আয়োজন হল। বিরাট কর্মের মূল হোতা যে, কেউ জানল না তার পরিচয়। কেবল হের ক্যানারিস জানলেই চলবে। তাই ষোল বছরের কাজের ফিরিস্তি দাখিল করতে হল তাঁর কাছে। আত্ম-অভ্যর্থনার জন্য লালায়িত নয় সে। কাজ নিয়ে কথা। সেটা আবার যে সে কাজ নয়, স্বর্গাদপি গরীয়সী যেই দেশ সেই মাতৃভূমির কাজ।

নিজেকে নিজে

(১৪ই আগস্ট)

॥ মোজাফ্ফর হোসেন ॥

এইদিন কেন আজ এতো রূপ পেলো?
মুক্তি পতাকা কেন রাঙায়িত হলো?
ধরণীর ম্লান-মুখ কেন রেঙে গেলো?
খুশীর তুফানে কেন সূর্যমুখী এলো?

সুরের প্রপাত ওই আকাশ কাঁপায়,
বীর সেনা হেসে হেসে মুক্তি-গান গায়।

প্রাণে কী বহেই শুধু খুশীর জোয়ার?
শুনা কী যায় না কানে দীর্ণ হাহাকার?

বিড়ম্বনা

॥ রফিকুল হক ॥

●

রাম রাম গড়গড়ি
খড়খড়ি
খুলে বসে
ভাব্‌ছে,
গাছে গাছে পাতাগুলো
শির শির
করে কেন
কাঁপ্‌ছে।

দূর ছাই
হুঁকোটায়
ধুঁয়া আর উঠছেনা
কষে তাই খুব সুখে
টান্‌ছে ;
কানাইটা ফাঁকিবাজ
কাজ ছেড়ে
হয়তোবা
অকামের ঢেঁকিটা
নিদ্রা রাঙার ধান
ভান্‌ছে।

রাম রাম গড়গড়ি
হুঙ্কারি হাঁক ছাড়ে
'ওরে ওরে নচ্ছার ব্যাটারে,
কল্কেতে তামাকের
অবশেষ নেই আর
আহা মরি
ভালো হলো লাঠারে!'
কার কথা শুনে কে
কানাই যে আরামে
প্রশস্ত বিছানার কোলটায়
আহা কত সুখেরে
রাঙা রাঙা আমেজে
স্বপ্নের পুঁথিগুলো ওল্‌টায়।

বাইরে যে অদ্ভুত
গাছে-মাঠে হাওয়াদের
লাখো লাখো জোয়ানেরা নাব্‌ছে,
রাম রাম গড়গড়ি
মহা ক্রোধে থরথরি
নিরুপায় হয়ে শুধু কাঁপ্‌ছে।

মিণ্টুর ম্যাজিক

॥ মিসবাহুল আজিম ॥

বাপ্‌রে বাপ্‌! টুকু আর টুলুর মতো দুষ্টু ছেলে আমি আমার জীবনে দেখিনি। লেখা-পড়ায় মনোযোগ তো একটুও নেই; সুযোগ পেলে ওরা স্কুল কামাই করতেও ছাড়ে না। দুষ্টুমিতে ওদের দু'জনার যত বুদ্ধি তার অর্ধেকও যদি পড়াশোনার কাজে থাকতো তবে আর বারে বারে অঙ্কের খাতায় লাড্ডু পেতে হতো না। কিন্তু সেদিন বড়-আপার বাড়ীতে মিণ্টুর হাতে ওরা দু'জন যা নাজেহাল হয়েছে তাতে ওদের সারা জীবনেও আর দুষ্টুমি করা উচিত নয়।

বড়-আপা রংপুর হতে চলে যাবেন শুনে ওরা সবাই দল বেঁধে তাঁর কাছে হাজির হলো। টুকু আর টুলু তো রইলই, তার ওপর সঙ্গে গেল মুকুল, পারুল, লতা, মুক্তা, হাসু, মিনু, বীনা, হেনা আর মিণ্টু। গিয়েই সবাই লাগালো চীৎকার।

'না, বড়-আপা, তোমাকে আমরা যেতে দেবো না।'

বড়-আপা সবাইকে শান্ত করার পর বললেন, 'আমিই কী তোমাদেরে ছেড়ে যেতে চাইছি নাকি? কিন্তু কী করবো? তোমাদের দুলাভাই যে বদলী হয়ে গেলেন।'

কিন্তু কে শোনে ওঁর কথা। সবাই বড়-আপাকে ঘিরে সেই একই কথা বলতে লাগলো। শেষকালে বড়-আপা একটা গান বের করলেন। সবাইকে নিয়ে একটা টেবিল ঘিরে বসলেন। তারপর একটা গান শোনালেন তিনি—

"...ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলো
এখন কতদূরে
আজ আসেনা রাজার কুমার
পঙ্খীরাজে চড়ে...।"

গান শেষ হবার পর সকলে যখন বড়-আপাকে আরেকটা গান গাইবার অনুরোধ করছে তখন হঠাৎ মিণ্টুটা বলে বসল, 'বড়-আপা ক্ষিদে পেয়েছে, বড়-আপা।'

টুকু আর টুলু একটু ভালো সাজার আশায় ধমকে উঠলো মিণ্টুকে, 'এই দুষ্টু কোথাকার...'

মিণ্টু কিন্তু বলল, 'বা রে, ক্ষিদে পেলে বলতে নেই বুঝি?'

বড়-আপাও ওকে সমর্থন করলেন 'হাঁ, হাঁ, ঠিক। আমার একটুও মনে ছিল না। যাও তো টুকু, পাশের ঘরে কতকগুলো কলা রয়েছে। নিয়ে এসো।'

টুকু কলা আনতে গেলো। টুলুও তার সাথে উঠলো। ওদের একটু পরে মিণ্টুও উঠল টেবিল থেকে। বড়-আপা তখন সবাইকে নিয়ে গল্প করছেন। কলাগুলো ছিল খুবই ভালো—বড় বড় পাকা শবরী। টুকু আর টুলুর তা দেখে জিভের পানি সামলা-নোই দায় হয়ে উঠলো। চট করে দু'জনেই প্যাণ্টের পকেটে দু'টো কলা ঢুকিয়ে ফেলল। মিণ্টু থুথু ফেলতে যাবার ভান করে উঠে সবই দেখতে পেলো। কিন্তু কিছু বলল না সে। শুধু মনে মনে হয়তো বা সুকুমার সেনের কবিতাটা আওড়ালো :

"মামদোবাজী আমার কাছে ?
রসো, এ রোগেরও অষুধ আছে।"

যাহোক, বড়-আপা শেষে সবাইকেই দু'টো করে কলা দিলেন। সকলের ভাগ শেষ হবার পরেও দেখা গেলো যে একটা কলা ডালিতে অবশিষ্ট রয়েছে।

বড়-আপা তখন তাঁর আদরের কুকুরছানা জনীর গায় হাত বুলোচ্ছিলেন। তাই দেখে টুকু প্রস্তাব করল, 'কলাটা জনীকেই দেয়া হোক।'

মুকুল বলল, 'কুকুরছানা আবার কলা খায় নাকি ?'

টুলু টুকুকে সমথন করল, 'হাঁ, খায়। আমি দেখেছি।'

মিণ্টু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে সে বলল, 'জনীকে দিয়ে আর কি হবে ? ও বিস্কিট খেতে ভালবাসে। তার চেয়ে আমার হাতে দিলে আমি একটা ম্যাজিক দেখাতে পারি।'

ম্যাজিকের কথা শুনে সবাই একসঙ্গে নেচে উঠলো। বলল, 'দেখাও মিণ্টু ভাই, কী তোমার ম্যাজিক।'

বড়-আপাও বললেন শেষকালে, 'আচ্ছা দেখি মিণ্টু, কী তোমার ম্যাজিক ?'

কলাটাকে হাতে নিয়ে গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে মিণ্টু বলতে লাগলো, 'এই যে কলাটা যা তোমরা সবাই আমার হাতে দেখতে পাচ্ছো, একটা মন্তর পড়ে আমি এটা হতে দু'টো কলা তৈরী করবো।'

টুকু বলল, 'সত্যি তুমি পারবে ?'

মিণ্টু বলল, 'হাঁ।'

'অত সোজা নয়।' টুকু নাক সিটকালো।

'পারলে তোমরা আমায় কী দেবে ?' মিণ্টু জিগগেস করল। হাসু বলল, 'তোমার এলবামের জন্যে আমি একটা সুন্দর টিকেট দেবো।'

পারুল বলল, আমি এমব্রয়ডারী শিখে তোমার রুমালে একটা গোলাপ তুলে দেবো।'

হেনা বলল, 'বেশ, আমি চার পয়সার চানাচুর খাওয়াবো।'

'আমি কিন্তু নিজেই কলা দু'টো নেবো। তা' বলে রাখছি।' মিণ্টু বলে রাখলো আগেই।

বড়-আপা বললেন, 'বেশ, তা নিয়ো। কিন্তু আগে ম্যাজিকটা দেখাও।'

'হুঁ, এ কলাটা আমি আমার প্যাণ্টের পকেটে রাখছি।' বলতে লাগলো মিণ্টু। 'তারপর একটা মন্তর পড়লে এটাই দু'টো হয়ে তোমাদের দু'জনের পকেটে চলে যাবে।'

কথাটা শোনার সাথে সাথেই সবাই হাত তালি দিয়ে উঠল, 'বা, বেশ মজা হবে তা'হলে। দেখি কার পকেটে যায়?'

তারপর সত্যিসত্যিই মিণ্টু চোখ-মুখ বুজে কী জানি সব আগাড়ুম বাগাড়ুম আওড়াতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল। 'হুঁ, হয়েছে। আমার পকেট হতে কলাটা দু'টো হয়ে টুকু আর টুলুর পকেটে চলে গেছে।' বলল মিণ্টু।

যেই না শোনা অমনি সবাই হুঁ-হুঁ করে হাতরাতে লাগলো টুকু আর টুলুর পকেট। এবং সত্যিই দু'টো কলা পাওয়া গেলো ওদের পকেটে।

টুকু আর টুলুর মুখটা তখন দেখবার মতো। ওরকম নাজেহাল ওরা আর জীবনে হয়নি। অথচ কিছু বলবারও উপায় নেই। তা'হলে নিজেদেরেই চোর সাজতে হবে।

এদিকে বড়-আপা তখন খুশী হয়ে দু'টো কলাই মিণ্টুকে দিয়ে দিলেন। আর অন্যেরা সবাই ওকে ঘিরে বলতে লাগলো, 'মন্তরটা আমাদেরো শেখাতে হবে, মিণ্টু ভাই।'

মিণ্টু কিছুই বলল না। মিট মিট করে হাসল টুকু আর টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে।

বড়-আপা চলে যাবার আগে আমাকে একদিন এ ঘটনাটা বলেছিলেন। তখনও তিনি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেন নি। আমি কিন্তু বুঝে নিয়েছিলাম যে এটা মিণ্টুর চালাকি, ম্যাজিক নয়। তোমরা কী বলো?

মায়ার বাঁধন

॥ এম, এ, হাশেম খান ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এইবার এক নূতন বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আর দমকা আগুনে হাওয়া বুড়ীকে বাধা দিতে লাগলো। এক জঙ্গলে বুড়ী চলেছে, হঠাৎ চারদিকের গাছপালায় আগুন জ্বলে উঠলো। সে কি আগুন! লকলকে শিখা একেবারে আসমানে গিয়ে যেন উঠেছে। বুড়ী জ্বলেপুড়ে মরবে আর কি! কিন্তু আসমানী ঘাবরাবার পাত্র নয়। এক লাফে বুড়ীকে নিয়ে সে আকাশে মেঘের আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু আকাশেও কি রক্ষা আছে! দেখতে দেখতে দারুণ শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এক-একটা কাঁটাওয়ালা শিলা বুড়ীর গায়ে সুঁচের ন্যায় ফুটতে লাগলো। মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে আর ফরফর করে বাজ পড়ছে। বুড়ী আকাশে আর টিকতে পারলো না, আবার নীচে নেমে এল।

আসমানীর কাঁধ থেকে নেমে সে দেখে, সামনে মস্ত বড় এক নদী। শিলাবৃষ্টি তখন থেমে গেছে, কিন্তু বেলা যে প্রায় ডুবু ডুবু। বুড়ীর চিন্তা হলো রাতটা কোথায় কাটাবে। চেয়ে দেখে ওপারে একটা গ্রাম। নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিবে, এই ভেবে আবার দৈত্যের কাঁধে সে চড়বে এমন সময় দেখলো, ওপার থেকে কে যেন একটা নৌকা বেয়ে আসছে; নৌকায় বসে আছে ছোট্ট একটি মেয়ে।

নৌকা কাছে আসতেই বুড়ী অবাক হয়ে দেখে মেয়েটা আর কেউ নয়—শাহজাদী গুলরোখ। গুল বুড়ীর দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছে।

আনন্দে বুড়ীর প্রাণ ভরে গেল। নৌকা পারে লাগতেই সে, 'ওমা গুলরোখ! গুল! কোথা থেকে এলি মা?' বলে নৌকায় উঠে বসলো। খুশীর চোটে আসমানীকে বিদায় করার কথা সে ভুলেই গেল। দানব নদী তীরে পাহাড়ের মত দাঁড়ায়ে রইল।

বুড়ী গুলকে কোলে নিয়ে বসলো। কোথায় ছিল, কে নিয়েছিল, কেন নিয়েছিল ইত্যাদি যত রাজ্যের কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। গুলরোখ কিন্তু কোন কথার উত্তর দেয় না, কেবল হাসে। নৌকা জোরে চলেছে।

মাঝ গাঙে পৌঁছেই নৌকা হঠাৎ ডুবে গেল। বুড়ী অবাক হয়ে দেখে—নৌকা নেই, মাঝি নেই, তার কোলে শাহজাদীও

নেই। নিজে তখন পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর একটু হলেই অক্কা পায় আর কি! পানি খেয়ে খেয়ে পেট ঢোল।

ভাগ্যিস্ আসমানী ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সে বুড়ীকে বাঁচালো। পারে উঠে বুড়ী চেয়ে দেখে—নৌকা দূরে থাক, নদীর চিহ্ন মাত্রও নেই। সামনে শুধু ধুধু মাঠ। মাঠের পর মস্ত উঁচু পাহাড়।

জান যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল আর কি! বুড়ী অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাতে লাগলো। ব্যাপারটা ধ্যান করে সে দেখলো। বুঝতে পারলো—এ সব মায়া। গুলকে যারা বন্দী করে রেখেছে তারাই বুড়ীকে তাড়াবার জন্য যাদুর খেলা শুরু করেছে। কিন্তু বুড়ীত দমবার পাত্রী নয়!

এদিকে রাত্রি হয়ে আসছে, আর দেরী করা চলে না! একটা আশ্রয় ত খুঁজে নিতে হবে। পাহাড়টা পার হওয়ার জন্য সে আবার আসমানীর কাঁধে চেপে বসলো।

দেও পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়া উড়ছে, এমন সময় বুড়ী শুনতে পেল, পাহাড়ের উপর কে যেন করুণ সুরে কাঁদছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য সে আসমানীকে থামতে বললো।

পাহাড়ের মাথায় পাতলা ঝোপ-জঙ্গল। সেখানে নেমে সে চীৎকার লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি চললো। কিছুদূর গিয়ে দেখে, একটা লোক বাঘের থাবার নীচে পড়ে কাতরাচ্ছে। বুড়ীকে দেখেই বাঘটা শিকার ছেড়ে তার উপর লাফায়ে পড়লো।

আসমানী সঙ্গেই ছিল। এক লাথিতে বাঘটাকে সে ঘায়েল করে ফেললো। কিন্তু কোথায় বাঘ, আর কোথায় সেই লোক! কিছুই নেই। বুড়ী একেবারে থ হয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে হেঁটেই সে চলেছে. পিছনে আসমানী। খানিকটা যেতেই আবার কার চীৎকার তার কানে এল, এবার কোন ছেলে বা মেয়ের মিহি গলা। বুড়ী সব বুঝতে পেরে মনে মনে হাসলো। ভাবলো এ আবার কি মায়া রে বাবা! আচ্ছা মজাটা দেখাই যাক! আসমানী সঙ্গে আছে, ভয়টা কিসের! বুড়ী এগোতে লাগলো!

কিছুদূর যেতেই তার চোখে পড়লো—বনের ভিতর ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর, আর সেই ঘরের সামনে এক দুষ্ট বুড়ী ছোট্ট একটা মেয়েকে সমানে লাঠি-পেটা করছে। মেয়েটা ভয়ে লাফাচ্ছে, দুই হাতে লাঠি ফেরাবার চেষ্টা করছে, আর চেঁচাচ্ছে। কাছে গিয়ে সে অবাক হয়ে দেখে মেয়েটা আর কেউ নয়, বাদশাজাদী গুলরোখ! তার পা থেকে মাথা অবধি কাঁটা দিয়ে উঠলো।

মেয়েটা বুড়ীকে দেখেই 'দাই-মা দাই-মা' বলে তার কোলে ঝাঁপায়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে

দাই-বুড়ীর মনে হলো, গুল যেন একটা আগুনের শেল হয়ে তার বুকের ভিতর ঢুকে পড়েছে। অমনি সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়ায়ে পড়লো।

দাই-বুড়ীর দশা দেখে দুষ্ট বুড়ীটা খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগলো। আসমানী নিকটেই ছিল। রাগে তার দু' চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। শয়তান বুড়ীটার চুলের মুঠি ধরে আছাড় দিবার জন্য সে হাত বাড়াতেই কোথায় যেন সে মিলিয়ে গেল। তার ঘর-দুয়ারের চিহ্নমাত্রও নেই।

আসমানী অচেতন দাই-বুড়াকে নিয়ে বড় ফাঁপড়ে পড়ে গেল। কোথায় তাকে নিয়ে যাবে সে! হঠাৎ তার পুরানো মনিব মুন্সী তরিবুল্লার কথা মনে পড়লো। বহুদিন সে মুন্সী সাহেবের খেদমত করে, এই কয় বছর আগে সে আযাদী পেয়েছিল; কিন্তু তার এমনই দুর্ভাগ্য—মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবার এই দাই-বুড়ীর হাতে বন্দী হয়েছিল। সে ভাবলো, বুড়ী যদি না বাঁচে, তবেত তার আযাদ হওয়ার আর কোন আশাই থাকে না! বুড়ী যে তাকে দোআ পড়ে আটক করে রেখেছে!

আসমানী বুঝতে পারলো, বুড়ীকে মারবার জন্য জিন-পরীরা মায়ার খেলা শুরু করেছে। ভয়ানক রাগ হলো তার। তার মনে পড়লো মুন্সী সাহেব জিন-পরীদের এলাজ খুব ভাল জানেন; তাঁর ভয়ে দেও-দানব, জিন-পরী সব কাঁপে। সে ঠিক করলো, তাঁকে ধরে দাই-বুড়ীকে বাঁচাতে হবে, আর এইসব দুষ্ট জিন-পরীদের শায়েস্তা করতে হবে। তখনই সে বুড়ীর দেহটাকে কাঁধে ফেলে পুবাকাশে ছুটলো। [ক্রমশঃ]

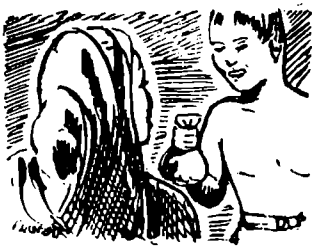

বর্ষা-রাণী

॥ নূরুল্ ইস্‌লাম কাব্যবিনোদ ॥

●

ছিঁচ-কাঁদুনে বর্ষা-রাণী,
কর্‌লো শুরু টিপ্‌টিপানী!
কখন হাসে, কখন কাঁদে,
ঢাল্‌ছে পানি ঘরের ছাদে!
টুপ্‌টুপাটুপ্ আওয়াজ তাহার,
শুন্‌তে ভালো লাগে আমার!
হঠাৎ যখন বজ্র ডাকে,
আর কী পরাণ ধড়ে থাকে?
কাঁপি যে ভাই থাকি থাকি,
মর্‌তে বুঝি নাইরে বাকী!
পাশেই ভরা-পুকুর জলে,
ভেকের তানে হৃদয় গলে!
সব ভাবনা যায় মিলিয়ে,
তাকাই দূরে জানালা দিয়ে!
ওই যে এলো ঝড়ো-হাওয়া,
হ'লো না আর দূরে চাওয়া!
জানালা দিয়ে ঝাপ্‌টা-পানি,
ভেজায় আমার শয্যাখানি!
আরও যে ভাই কত আপদ,
রাস্তা চলা মহা বিপদ!
জমেই আছে গাদা-গাদা,
মাঝে মাঝে খাস্তা কাদা!
চল্‌তে যে যাই পিছলে পড়ে,
এতো জ্বালা সই কি করে?
গাছের ডালে ভেজা-পাখী,
করুণ-সুরে উঠছে ডাকি!
অসুবিধা আছেই মেলা,
তবু' ভালাই ছোট্ট-ভেলা!
ভরা-বিলে খেলা করি,
সারা দুপুর বেলা ধরি!
মেঘের মেয়ে বাদল-রাণী,
সরস করে জগৎখানি!

ন' মামার কাণ্ড

॥ আল্-ফারুক ॥

বেখেয়ালী মানুষ নিয়ে মাঝে মাঝে এমন মুশকিলে পড়তে হয় যে তা আর বলবার নয়। আমার এই ন'মামা, বুঝলে মণি, এমনি একজন মানুষ। তাঁর মত এমন মন-ভোলা মানুষ সংসারে আর দোস্‌রা আছে কি না সন্দেহ।

সম্প্রতি মামা যে কাণ্ডটা করেছেন সে-টাই বলছি। কারণ, মামার এ কাণ্ডটা আমি নিজ চোখে দেখেছি। আর, এটাই অন্যান্য তাবৎ ঘটনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সেবার কি একটা ছুটি উপলক্ষে মামা-বাড়ী বেড়াতে এসেছি। আর সেই তখনই ঘটেছে এ ঘটনা।

দুপুর বেলা, হাঁপাতে হাঁপাতে ন'মামা এসে হাজির। এ সময় সাধারণত তিনি কোন দিন বাড়ী আসেন না কি না, আমরা তাই তাজ্জব মানলাম। মামার দামী ট্রাউজারটা ঘামে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেছে। মোটা-সোটা, গোল-গাল মানুষটি। সমস্ত শরীর দিয়ে বরফ গলার মত ঝড়ছে ঘর্মস্রোত।

আমি আর মামী তখন লুডুর ছক পেতে বসেছি। মামী পান চালছেন।

—আমার চাবি? মামা তখনও হাঁপাচ্ছেন।

—চাবি! মামী মুখ না তুলে বলেন—আমি কি জানি?

—আহা খুঁজে দেখো না। পাচ্ছিনে যে। আপিসের চাবি। কি মুশকিল!

—দাঁড়াও চালটা দি···

—আরে না-না। মামা অধৈর্যের সঙ্গে বলেন—আপিসের চাবি বুঝছো না, আপিসের ড্রয়ারের। এখনই টাকা বের করে দিতে হবে যে। মামার যে রকম অস্বস্তিকর উত্তেজনা দেখলাম, নিশ্চয়ই কিছুটা বিপাকে পড়েছেন বলে মনে হ'ল।

—চলো মামী খুঁজে দেখি। আমি বলি।

—আর পারিনে বাবু। মামী ঝংকার দেন।

মামা তখন চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছেন। এ ঘর ও ঘর পায়চারী করছেন। চাবি কোথায় গেল?

—দুত্তোরি খেলার নিকুচি করেছে। লাথি মেরে লুডুর ছকটাকে ফেলে দিলেন মামা। পায়ে পায়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো গুটিগুলো।

—আমার চাবি কোথায় গেল এ্যাঁ?

মামার হেন অবস্থা দেখে, বুঝলে মণি, আমাদের আর বাক্য ব্যয় করবার অবসর রইলো না। খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল।

—কোথায় রেখেছ? মামী শুধোন।

—মনে আছে নাকি? মনে থাকলে আর তোমায় বলি!

—কিছুই কি মনে পড়ছে না? কোন্‌খানটা···

—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, সামান্য মনে পড়ছে যেন...

—কোথায়?

—দেখো তো বাক্সের তলাটা।

—তোমার মাথা। আগুন হয়ে ওঠেন মামী। খুব মনে আছে! বাক্সের তলায় যাবে চাবি? যেমন আক্কেল।

তবু সমস্ত ঘরটা আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে ভুললাম না। কি জানি, বেখেয়ালী মানুষ, মনের ভুলে যদি রেখেই থাকেন। কিন্তু, কই? কোথায় চাবি! সম্ভব, অসম্ভব—কোন জায়গায়ই খোঁজা আর বাদ রইলো না। সার্টের পকেট, টেবিল, চেয়ার, লেপ, তোশক থেকে আরম্ভ করে রন্ধনশালার আনাচে-কানাচে পর্যন্ত বাদ পড়লো

না। কিন্তু যেমনটি সে-ই—চাবি পাওয়া গেল না।

—কোথায় ফেলে দিয়েছো, ঠিক নেই! মামী বলেন।

—সম্ভব। আমি সায় দেই।

—ফেলে দেব? মামা মুখটা বাঁকিয়ে একটু ভাবলেন—হ্যাঁ, হতে পারে। আবার পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন—না না, ফেলবো কোথায়? পকেটেই তো ছিল।

—পকেটেই তো ছিল! মামী ব্যঙ্গ করে পুনরোক্তি করলেন—তো পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

—ওই তো মুশকিল! মামা বলেন একটু ভেবে—দাঁড়াও-দাঁড়াও, একটু একটু মনে পড়ছে যেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কাল্ বাস থেকে নেমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাড়ী ঢুকেছি।

—তখন ছিল? শুধোন মামী।

—ছিল বই কি।

—তবে তো বাড়ীতেই থাকবার কথা।

আবার সকলে খোঁজ-খোঁজ। আর এক চোট তাবৎ জিনিস-পত্র লণ্ড-ভণ্ড করে খুঁজে দেখা হ'ল। কিন্তু, হায় খোদা, কই চাবি?

—আপিসে তো নিয়ে যাওনি, মামা? আমি বলি।

—আপিসে? ধ্যাৎ—

—তোমার মামার বিশ্বাস নেই। আর তা ছাড়া, ওটা আপিসের চাবি, আপিসে নেওয়াটাই স্বাভাবিক।

—আপিসে ভাল করে খুঁজে দেখেছো তো? মামী জিজ্ঞেস করেন।

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, একটু ভাবি। বলে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা চুলকিয়ে তিনি খানিকক্ষণ ভাবলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে, চেয়ারটা যেন হাতড়িয়েছিলাম।

—আর টেবিলটাও.. ?

—কাগজ-পত্তর?

—এ্যাঃ! ঠিক মনে পড়ছে নাতো।

—চুক! মামী অধৈর্যের সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকান—তুমি কি? তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন—তোমার মামার আপিসটা খুঁজে দেখে এসো তো একবার। কী মুশকিল!

সাইকেলটা নিয়ে বের হবো, এমন সময় মামা বলেন—আরে না-না, ও যাবে কেন? ক'দিনের তরে একটু বেড়াতে এসেছে, ওকে কেন? না-না ওকে কেন? ও খোকা, দাঁড়া-দাঁড়া। বলে মামা পিছু পিছু খানিকটা এগিয়ে এলেন। আমি পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াতেই, মামা বলেন তুই কেন? আমিই যাচ্ছি। তারপর একটু থেমে কি ভেবে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, না হয় তুই যা। চাবিটা বোধ করি, আপিসেই আছে। একটু ভাল করে খুঁজে দেখিস, বুঝলি? টেবিলের তলাটা, ড্রয়ারের তলাটা, হ্যাঁ, খুঁজতে ভুলিসনে যেন!

আপিসেও অনেক খোঁজাখুজি করলাম। কিন্তু, নাঃ, তবু ন' মামার হারানো চাবি উদ্ধার করা গেল না।

বাড়ী ঢুকতেই ছুটে এলেন মামা।

—পেলি? পেলি চাবি?

—না।

—না, কিরে? রেগে তিনি টং। তবে কি চাবি হাওয়া হয়ে গেল?

—চাবিটা কোথায় গেল বলতো? আপিসের চাবি! আচ্ছা, ওই কেলেটা নিলো না তো! বলেই উচ্চৈস্বরে হাঁকতে লাগলেন—কেলে, কেলে—ওরে, কে—লে—

—জী! চাকুর কালু এসে সামনে দাঁড়ালো।

বলাবাহুল্য, এতক্ষণ সে-ও খুঁজছিল আশপাশের ঘরগুলো।

—হারামজাদা! গর্জে উঠলেন মামা। চাবি কোথায়, বল্?

—জী, আমি তো জানিনে! কালু যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আলবৎ জানিস। বল্ কোথায়?

কালু ঢোক গিলে, মাথা নিচু করলো।

—ওকে কেন বকছো? মামী বলেন। ও কোথা থেকে জানবে?

—তুমি জানো না, চাবি ওই নিয়েছে। আমি কোথায় যেন রেখেছিলাম ও দেখে ফেলেছে, তারপর টুপ করে—বলে মামা হাতটাকে ঈষৎ টেনে এক ধরনের ভঙ্গী করে চুরির পদ্ধতিটা দেখালেন।

—ও চাবি দিয়ে কি করবে? যদিও কথা বলবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, কিন্তু পাছে বেচারা কালু আবার আমার মত চড় খায়, তাই তাড়াতাড়ি কথাটা বলতে হ'ল।

—কি করবে আবার? আপিসের ড্রয়ারে টাকা-পয়সা...

—কিন্তু। কালু ভয়ে ভয়ে বলে আমি তো আপিসই চিনিনে।

—তাই তো, আমি সায় দেই। ওতো আপিসই চেনে না···

—ও হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। কিন্তু—মামা একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন,—চেনে না—আবার চিনতে কতক্ষণ?

—কিন্তু...। কালু কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

—চোপ! মামা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন।

কালু একটা বড়সড় ঢোক গিলে মাথা নীচু করলো।

—তুমি মামা, খামোখা ওকে দোষাচ্ছ। ভয়ে ভয়ে বলি—চাবি ও নেয়নি।

—নেয়নি তো হাওয়া হয়ে গেল?

—কোথাও ফেলে দিয়েছো হয়তো।

—ফেলে দিয়েছি? আপিসের চাবি। ইস্! তা-তা হতে পারে। কিন্তু···

হঠাৎ ন' মামা পায়চারী বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর স্তব্ধতার পাহাড় চিরে নিষ্ঠুর কণ্ঠে ডেকে উঠলেন—ঝি—ঝি—ঝি—

—আবার ঝিকে ডাকছো কেন? মামী উৎকণ্ঠিতভাবে বলেন।

—তুমি জানো না, ওই নিয়েছে। আমার মন যা বলে, তা ঠিক হয়। ঝি—ঝি—

ত্রস্তপদক্ষেপে দুরু দুরু বুকে ঝি এসে অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়ালো।

—কই এলো?

—এই তো এসেছে? আমি বলি।

—এসেছে? হ্যাঁ—এসেছেই তো! এই যে ঝি—চাবি বের করো বলছি; ভাল হবে না কিন্তু! কোথায় রেখেছ চাবি?

—চাবি? আৎকে ওঠে ঝি। চাবি আমি কি করবো?

—কোথায় রেখেছ বল? মামা গর্জে উঠেন ঝি তো ভয়ে কেঁদে ফেললে।

—ঝি চাবি দিয়ে কি করবে, মামা? আমি শুধোই।

—তুই জানিসনেরে খোকা। তোর তো কাঁচা বুদ্ধি। আজকের চোরেরা কেমন তুই কি করে জানবি? ঝি চাবি নিয়ে দেবে ওর স্বামীকে। ওর স্বামীর সঙ্গে বুঝলি, আপিসের পিয়নের—না পিয়ন না, ধর, হ্যাঁ ধর, চাকরটা,—ওই যে বুধো নাপিত, তার সঙ্গে খাতির থাকাটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তারপর বুঝলি—

—ধ্যাৎ, মাথা খারাপ নাকি? মামী একপ্রকার ধমক দিয়ে ওঠেন।

—তবে? তবে চাবি উড়ে গেল? ওর কি পাখনা গজালো এঁ্যা?

—তুমিই হয়তো কোথাও ফেলে এসেছো। এখন তম্বি চালাচ্ছ এদের ওপর!

—ফেলে এসেছি? কিন্তু···

—হ্যাঁ, মামা, নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে এসেছো। বাড়ীতে থাকলে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।

—ঠিক বলছিস? ঠিক?

ঝি এই সময় সামনে থেকে সরে যেতেই মামা আবার চীৎকার করে উঠলেন—ঝি—ঝি—ঝি—যেও না। এখানে দাঁড়াও! চাবিটা বের করতেই হবে।

—চাবি যদি নাই থাকে, আমি বাৎলাই, খুঁজলে আসবে কোথা থেকে?

—চাবি নিশ্চয়ই আছে। এই বাড়ীতেই আছে।

—কোথায়? কোথায়? আমি শুধোই।

—তোর মামীই হয়তো নিয়েছে। আমার মন বলছে।

মামী এই সময় পাশের ঘরে গিয়েছিলেন। তাই কথাটা শুনতে পেলেন না।

—তোমার এই দরকারী মুহূর্তে মামা চাবি আটকে রাখবে? আমি প্রতিবাদ করলাম।

—তোর মামী, জানিস তো, পদে পদে আমাকে বিপদে ফেলে।

মামী এই সময় ঘরে ঢুকতেই কথাটা শুনে ফেললেন।

—কি? কি বললে?

—চাবি দাও।

—চাবি কোথায় পাবো?

—তুমি নিয়েছ!

—দেখো, মিছে বাজে কথা বলো না। আমার ভাল লাগে না।

—তুমিই নিয়েছ। আমার মন বলছে।

—মামা, তুমি মিছে মাথা খারাপ করছো। মামী নেননি।

—সাট আপ! মামা বেজায় উত্তেজিত। তোর মামীই নিয়েছে।

—আমি নেইনি। মামী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেন—আমায় বিশ্বাস করো।

—তবে চাবি হাওয়া হয়ে গেল? তুমি নিয়েছ।

—এঁ্যা! শেষ অবধি আমিই নিয়েছি! মামী কেঁদে ফেললেন। শেষে আমিই চোর হলাম। আমার কি হবে···

—ভাবী নেননি, ভাই সা'ব। চাকরটা এই সময় বলে বসে।

আর যায় কোথায়! আগুনের মুখে যেন একেবারে শুকনো বিচালি দেওয়া। আগুন লাফিয়ে উঠলো।

—চোপ, হারামজাদা বের হয়ে যা আমার বাড়ী থেকে! আরে-আরে দাঁড়া। আমার চাবি দিয়ে যা। তুমিই নিয়েছ শয়তান। মামীকে ছেড়ে মামা আবার কালুকে নিয়ে পড়লেন। তার গালে সশব্দে একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিয়ে যেন চাবি না পাওয়ার আক্রোশটা মেটালেন। অল্প বয়েসী কি না, চড় খেয়ে কালু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো।

* * *

সন্ধ্যার পর দুরু দুরু বুকে বাড়ী ফিরতেই মামী বলেন—জানো খোকা, তোমার মামার চাবিটা পাওয়া গেছে।

—কোথায়? আশ্চর্য ও উৎফুল্ল হয়ে বলি—কোথায় পাওয়া গেল?

—কানের পিঠে।

—কানের পিঠে? বল কি মামী!

—হ্যাঁ-গো হ্যাঁ। সারা দিন আমাদের কি হয়রানিটাই না করালেন অথচ, চাবি কানের পিঠেই ছিল।

—কি করে গেল?

—কাল নাকি আপিস থেকে ফিরবার সময় কান চুলকাতে চুলকাতে বেখেয়ালে কানের পিঠে গুঁজে রেখেছিলেন। অথচ, আমাদের বললেন কি না, চাবি পকেটে করেই বাড়ী ঢুকেছি'। কি যে মানুষ!

ফুল ও মূল

"প্রবাস"

ফুল মূলেরে একদিন জিজ্ঞাসা করে হেসে হেসে,
— ছিঃ, কিবা দুখে আছিসরে ভাই মাটিরে ভালবেসে ?
ঊষার আলোয় চেয়ে দেখ্ তুই আমার রূপরাশি,
তোর ওই কালো রূপ দেখে পায় যে বেজায় হাসি।'

মূল বলিল মৃদু হেসে,—'কিসের এতো গর্ব ভাই ?
আমি আছি মাটির নীচে তোদের যত দর্প তাই।
মাটির তলে রয়েছি আমি মাটিরেই ভালবাসি,
সে তো কেবল তোদের মলিন মুখে ফুটাতে হাসি।
ক্ষণ জীবনের অধিকারী তাতেই এতো গৌরব !
আর কত কাল রাখবি ছড়ায়ে তোর ঐ সৌরভ ?
আমি রব তোদের মত কত লাখো ফুল ফুটাতে,
ক্ষণিক পরে তোরেই হবে এই চরণে লুটাতে।'

ফুল বলিল,—'তবু যেটুকু পৃথিবীতে বেঁচে যাই,
সবারে ভালবাসি সবারে আনন্দ দিতে চাই।
তাই যুগযুগ ধরে আমাদের ভালবাসে সবে,
তোর জীবন-মরণে কেবা স্মরণে রেখেছে কবে ?'

মূল বলে,—'রূপহীন নতশীরে নিজ কাজ করি,
জানে সবাই তোর গর্ব সে তো আমার বাহাদুরি।
আমার কাজেই আনন্দ—নাহি সুনামের অভিলাষ,
তোদের আলোকে উজ্জ্বল হয় আমার অন্ধাবাস।'

সাহিত্য ও কিশোর-সমাজ

॥ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ॥

আয়নার সামনে মানুষ দাঁড়ালে যেমন তার প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরকম সাহিত্যে প্রকাশ পায় মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের বিভিন্ন রূপ। সেজন্যেই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের রয়েছে নিগূঢ় সম্বন্ধ। নদীতে বাস করতে গেলে যেমন পানিকে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেইরকম সমাজ বাদ দিয়েও সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, সম্বন্ধ অনেকটা ভাই-বোনের মত।

সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সমাজকে নিয়েই জীবনের প্রথম পদক্ষেপের প্রাভাতিক সূচনা। শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, সব শ্রেণীর জীব-জন্তুর মধ্যেই এই সাম্য লক্ষিত হ'বে সুস্পষ্টভাবে। আমাদের দেশের কিশোর-জীবনের সঙ্গে কিশোর-সমাজের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিশোরদের মনের অনুভূতির অদ্ভুত যোগ সাধনের ক্ষেত্র এই সমাজ। তাই আজ কিশোর-সাহিত্যে দেখতে পাই তাদের জীবনের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি। বর্তমানে কিশোর-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সাহিত্যের প্রকৃত রূপ কী এ সম্বন্ধে বিচার করে দেখা প্রয়োজন আমাদের।

গোড়া থেকেই সবকিছু বিচার করে দেখা দরকার। সাহিত্যিক সাধারণত রূপস্রষ্টা। কিশোর-সাহিত্যিক কোন জিনিসের রূপ ফুটিয়ে তুলবে নিপুণ ঘটনাবলী, ভাষার কারুকার্যে এবং বিবৃত ঘটনাকে মধুর ছন্দের সাহায্যে। অনেক সময় প্রয়োজনের জন্যে আমরা সাহিত্যে রূপ বিচার বাদ দিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে প্রয়াসী হই। এখানে সাহিত্যের স্তর বিভাগের প্রশ্ন ওঠে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই রকমের হ'তে পারে: প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে নিছক আনন্দ দেওয়া হয়, দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সাহিত্যের এই দ্বি-ধারা উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যেরই সমান প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্য যেমন Arts for Arts' sake সম্বন্ধে সত্যি, তেমনি প্রচণ্ড সত্যি Arts for man's sake সম্বন্ধে।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে জানতে পারি বিভিন্নভাবে। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এ কথাটি প্রযোজ্য। একজন খ্যাত নামা লেখক এই কথাটিই বলেছিলেন বহু পূর্বে: The whoe theory of the universe is directed unerringly to one

single individual—namely to you. বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাহায্যে আমরা জগতের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারি। নিজেকে না জানলে অপরকে জানা যায় না কোনদিন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। সাহিত্য মানব জীবনের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে' মানুষের বুদ্ধি, বাসনা প্রভৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর একটি কথা বলেছেন: "পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি রচনা করে সাহিত্য।" প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য সমস্ত মানুষকে গঠন করে' তোলে এবং তার প্রকৃত কাজও তাই। সাহিত্যে সকলেই সত্যের পরিবর্তে মানুষকে পেতে চান। কিশোর সাহিত্যও এই নীতি থেকে বহির্ভূত নয়। তার প্রধান কর্তব্য সাহিত্যের মাধ্যমে কিশোর সমাজের নব-রূপায়ণ। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে সত্যিকারের কিশোর সমাজ। যে সমাজের মানুষ হ'বে সকল কালের, সকল যুগের মূর্ত আদর্শ।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজ এবং মানুষের প্রকাশ হ'তে পারে নানাভাবে। কিশোর সাহিত্যিক যেভাবেই সাহিত্যে নিজেকে প্রকাশ করুক না কেন তার মধ্যে গভীর জীবনতাবোধ থাকা চাই। সে যেন মনে রাখে: Let a man seek pleasure every where except in himself. বর্তমানে অনেক কিশোর কবি সাহিত্যিক idisynerasy বা ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে সাহিত্য রচনা করে' থাকে। এ যেমন ভুল তেমনি মারাত্মক। এর ফলে কিশোর সমাজ আর সাহিত্য দুইই দুর্বল হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য সে Aesthetics বা রসতত্ত্বের বিচার করতে পারে নানাভাবে, তাতে আপত্তির কিছু নেই। সে নিজে যা দেখবে তা নির্ভুল এবং অভ্রান্ত হওয়া চাই। এ সম্বন্ধে ব্লেক বলেছেন: It is I who see and feel. I see only what I see and feel only what I feel. My experience is mine, in its specific quality lies its significance. কিশোর-সাহিত্যিক তখনই সমাজকে নতুন চেতনা দিতে পারবে যখন তার মনের প্রসারণ আর চিত্তজাগরণ সম্ভব। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া জাগিবে তখনি—

কিশোর লেখক যে সমাজ সৃষ্টি করবে তা হবে চিরকালের মানব-শ্রেণীর জন্য শাশ্বত এবং সুন্দর। পৃথিবীর বিহ্বলতা দেখে দমে গেলে চলবে না। তার হাতে ভার রয়েছে নতুন জগৎসৃষ্টির, এ কাজ করার শেষে তার ছুটি মিলবে। বলদীপ্ত কণ্ঠে তাকে বলতে হবে—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" পৃথিবীর কদর্যতা দেখে দূরে সরে গেলে তার কর্তব্য পালন করা হ'বে না, কদর্যতা দূর করে তাকে রোপণ করতে হ'বে সোনালী ধানের শিষ। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত তাকেও উচ্চ কণ্ঠে গাইতে হ'বে:

I am not the poet of Body, and
I am the Poet of the soul

I am not the poet of goodness only,

I do not dectine to be the poet of wickedness only.

কিশোর-সাহিত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে বিচার করে দেখা দরকার সবার। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, বাস্তবকে সকলে একই চোখে দেখে বিচার করে না, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে বস্তুকে বিচার করে বলে সাহিত্যেও বাস্তবের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কিশোর-সাহিত্যও ঐ দোষমুক্ত নয় সম্পূর্ণভাবে।

বস্তুজগতে প্রবেশ করার বিভিন্ন দরজা আছে। বিভিন্ন কিশোর সাহিত্য লেখক বিভিন্ন দরজা দিয়ে তার ভেতরে ঢুকে বস্তুকে দেখার চেষ্টা করে বলে তাদের দেখার মধ্যে থাকে যথেষ্ট পার্থক্য। অনেকের মতে বস্তুজগতের দিক্ বিচার করা যায় দু'ভাবে। প্রথম ভাগ সত্য আর দ্বিতীয় ভাগ তথ্যের দিক্। সত্য সীমাবদ্ধ এবং আমরা সে যেমন আছে তেমনভাবেই দেখে থাকি। তথ্য অসীম বলে এর দেখার মধ্যেও থাকে বিভিন্নতা এবং এর ফলেই সাহিত্যে বিভিন্নতা ধরা পড়ে। বস্তুজগতে সার্থক সত্যই প্রকৃত সত্য। সত্যের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে তার মধ্যে। যার মধ্যে যথার্থ সত্যের পরিচয় নেই সে সত্য সাধারণ। কিশোর-সাহিত্যে এর প্রকাশ না হলেও ক্ষতি হ'বে না। কিশোর-সাহিত্যিক কিশোর-জীবনের প্রকৃত সত্যেরই সন্ধান করবে।

এই হ'ল কিশোর-সাহিত্যের রূপায়ণ সম্পর্কে প্রকৃত কথা। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন—তা হ'ল কিশোর-সাহিতের যুগধর্মের কথা। আমাদের এই পৃথিবীটা দিনের পর দিন যেমন বদলে যাচ্ছে পরিবর্তনের স্রোতের প্রভাবে কিশোর-সাহিত্য-জগৎও এ পরিবর্তনের ঢেউ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার কারণ, কোন সাহিত্যই দেশ আর কালের প্রভাববর্জিত নয়। সাহিত্য নতুন কালের মুখে নতুনভাবে জন্ম নেয় বলে তার অভ্যন্তরেও দেখা দেয় প্রচণ্ড আলোড়ন। বর্তমানে আধুনিক যুগে নাকিসুরে প্রাচীনের গান গাওয়া যেমন দৃষ্টিকটু, আবার ঠিক তেমনই গাইতে হ'বে আগামী দিনের সবুজ গান। সে যেন সাহস করে বলতে পারে: The modern man I sing.

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রকৃত কিশোর-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারছে না বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে। নিজের শক্তি দিয়ে এই অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠতে হ'বে তাকে। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে আগামী দিনের জগৎ। তার সুনিপুণ তুলিকার সাহায্যেই শ্যামল বাংলার প্রান্তর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে রঙিন সূর্যের সোনালী আভার ভাস্বর দীপ্তিতে।

বাইশে শ্রাবণ

॥ এ. বাসির ॥

আবার এসেছে সেই বাইশে শ্রাবণ ;
তাই আজি সিক্ত-নেত্রে বিশ্ব-জনগণ
বন্দিছে তোমারে,
অশ্রু-পুষ্প হারে।
তারি সাথে রাখিবারে দাও মোরে
চরণ-কমল 'পরে
এক বিন্দু নয়নের নীর,—
ভক্তি-অর্ঘ-পুষ্প-সম অতল-গভীর।
নিখিলের মর্মস্থল হতে
দুর্বার প্লাবন-স্রোতে
ভেসে আসে কোন এক মর্মভেদী সুর—
বুঝি পুত্রহারা বেদনা-বিধুর
এ বঙ্গ-ভারতী,
খুঁজিয়া ফিরিছে তোমা—করিছে আরতি।
ওগো প্রকৃতির রূপ-মুগ্ধ কবি,
ওগো রবি,
তুমি নাই,
আজ তাই,
ঝরে না শ্রাবণ-ধারা
পাগল-পারা।
কে সাজাবে আজি শ্রাবণের ডালা ?
কে গাঁথিবে আজি কাব্য-পুষ্পমালা
ভরিতে বাণীর ডালি ?
তুমি নাই, আজ তাই—খালি, সব খালি।

—0—

বোবা

॥ হেমায়েত হোসেন ॥

এক শহরে ছিল দুই বন্ধু।

কিন্তু রাজপুত্র আর কোটালপুত্র নয়—দুই গরীবের ছেলে। একজন খোঁড়া, আরেকজন বোবা। দু'জনে মিলে মিশে ভিক্ষা করে। এ পাড়া ও পাড়া, এ রাস্তা ও রাস্তা—সব জায়গাতেই দু'জনে এক সংগে যায়। ভিক্ষা ক'রে যা পায় দু'জনেই তা সমান অংশে ভাগ করে নেয়। কিন্তু এক জায়গাতেই ত আর প্রতিদিন ভিক্ষা পাওয়া যায় না। নতুন নতুন জায়গাতে যেতেই হয়। বোবা অবশ্য হাঁটতে পারে যথেষ্ট, কিন্তু খোঁড়াকে নিয়েই চলা মুশকিল। সে বেশী দূর হাঁটতে পারে না। খোঁড়া-পাখানাকে টেনে টেনে হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে কিছুদূর গেলেই হাঁফিয়ে ওঠে। তখন বাধ্য হয়ে সেখান থেকেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। কিন্তু ভিক্ষা খুব বেশী পায় না তাতে। তাই একদিন দুই বন্ধু মিলে স্থির করল যে দু'জনে পৃথক পৃথকভাবে ভিক্ষা করবে। তাতে ভিক্ষাও বেশী পাবে আর বোবাও নিজের ইচ্ছামত অনেক দূরে দূরে গিয়ে ভিক্ষা করতে পারবে।

পরামর্শমত দু'বন্ধু পরদিন থেকেই পৃথক-ভাবে ভিক্ষা আরম্ভ করল এবং দিনের শেষে দেখা গেল যে সত্যি সত্যিই ওরা আগের চেয়ে অনেক বেশী ভিক্ষা পেয়েছে। বোবা আনন্দে আরও বোবা হয়ে গেল।

কিন্তু কিছুদিন পর খোঁড়ার মুখ গেল ভার হয়ে। সে দেখল যে বোবাই বেশী ভিক্ষা পাচ্ছে। খোঁড়াকে দেখলে পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা তাড়া দেয়, ভেংচি কাটে, উপহাস করে, কিন্তু ভিক্ষা দেয় না।

অথচ বোবা প্রতিদিনই ভিক্ষার ঝুলি ভরে আনছে। খোঁড়ার সারা মন ঈর্ষায় বিষাক্ত হয়ে উঠল। সে করল কি, জানো?

একদিন এক বাড়ীর দরজায় গিয়ে বোবার মত গোংগাতে আরম্ভ করল। ভাবল, বোবা হলেই বুঝি বেশী আয় করা যায়। এমন সময় বাড়ীর বুড়ো কর্তা কোথাও যাবেন বলে লাঠি হাতে ঠকঠকিয়ে বেরুচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই ও হাত নেড়ে নেড়ে ভিক্ষার জন্য ইশারা করল।

বুড়ো ওর ভাবভংগীতে বেশ মজা পেলেন বল্লেন—"কিরে, বোবা নাকি তুই?"

খোঁড়া চট করে উত্তর দিল—"হ, ছা'ব, আমি বোবা।"

—"এ্যা, বোবা! এইত দেখছি তুই বোবা নস্।"

খোঁড়া হঠাৎ ক্ষেপে গেল—"কি কন, ছা'ব। আমার বাপ-দাদায় চৌদ্দ পুরুষ বোবা আর আমি বোবা না।"

বুড়ো তখন হো হো করে হেসে উঠেছেন "আরে, বোবা মানুষে কথা বলে কি করে?"

তাইত! এতক্ষণে খোঁড়ার হুঁশ হ'ল। তারপরই চট্ করে পিছন ফিরে খোঁড়া-পায়েই দিল চোঁচা দৌড়। শেষে কি বোবা হতে গিয়ে ভাল পা-খানাও খোঁড়া করে আনবে?

একটি আশ্চর্য গুহা

॥ চৌধুরী ওসমান ॥

চীন দেশের একটি পাহাড়ের পাদদেশে একখানি ছোট্ট বাড়ী। সেখানে চ্যাং নামে এক রাখাল বাস করিত। তাহার মাতাপিতা কেহই জীবিত ছিল না। একমাত্র বৃদ্ধা দাদী তাহার রান্নাবান্না করিয়া দিত।

একদিন চ্যাং যখন গরুর পাল চড়াইতেছিল তখন সে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখিতে পাইল। প্রবেশপথে একটি বিরাট পাথরের দরওয়াজা আটকান ছিল। চ্যাং তবু ঐ গুহাটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং ভাবিয়া আশ্চর্য হইল—কেন উহা এতদিন তাহার নজরে পড়ে নাই। এমন সময় সেখানে জনৈক বৃদ্ধ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাইতেছিল।

বৃদ্ধ গুহার প্রবেশমুখে আসিয়া থামিল এবং যেন দরওয়াজাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল: হে পাষাণ দুয়ার, খুলে যাও। কিউকু প্রবেশ করতে চায়। সে ইহা একাধিক্রমে তিনবার পুনরাবৃত্তি করিল। তৃতীয় বারে দরওয়াজার পাল্লা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল এবং লোকটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

চ্যাং অনুভব করিল যেন সে আর এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে না, যদি না সে এই গুহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারে। ইহার পর কি ঘটিবে দেখিবার জন্য সে উদগ্রীব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিল, তবু সেই নিশ্চল, বন্ধ দরওয়াজা ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়িল না। অবশেষে দরওয়াজা খুলিয়া গেল এবং বৃদ্ধ লোকটি বাহির হইয়া আসিল। এখন তাহাকে অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখাইতেছিল। চ্যাং লোকটিকে বলিতে শুনিল: হে পাষাণ দুয়ার, বন্ধ হও। কিউকু প্রস্থান করছে। তখন দরওয়াজাটি আগের মতই বন্ধ হইয়া গেল এবং উহা এতো স্থির ও কঠিন মনে হইল যে, যুবক আশ্চর্য হইয়া গেল—যেন উহা আর কখনও খুলিবে না।

যখন বৃদ্ধ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, যুবক মনে করিল যে সে দরওয়াজা খুলিয়া গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিবে উহার মধ্যে কি আছে। সে হাতের লাঠি দিয়া আঘাত করিল এবং সমস্ত শক্তি দিয়া উহা নাড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দরওয়াজাটি পাহাড়ের মত স্থির হইয়া রহিল। অতএব সে গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। কারণ তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সে উহা ভুলিতে পারিল না। পরবর্তী কয়েকদিন তাহার মনে এই প্রশ্ন বারবার জাগিয়া উঠিল: কে এই গুহার মালিক—আর ইহার ভিতরেই বা কি আছে? প্রত্যহই সে ভাবিতে লাগিল, সেই হলুদ রঙের বৃদ্ধ লোকটি গুহার মধ্যে কি দেখিতে আসে।

অবশেষে সে স্থির করিল, বৃদ্ধ লোকটির মুখে শোনা সেই কথাগুলি দিয়া দরওয়াজা খোলা যায় কি না। অতএব সে গরুগুলি মাঠে ছাড়িয়া দিয়া সেই গুহার কাছে গেল এবং বলিল: হে পাষাণ দুয়ার, খুলে যাও। চ্যাং প্রবেশ করতে চায়। এই মুহূর্তে কি ঘটিবে তাহা সে কিছুই ভাবিতে পারিল না। কারণ, দরওয়াজা একটুও নড়িল না। তখন সে মনে করিল যে বৃদ্ধ কথাগুলি তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিয়াছিল। অতএব আরো দুইবার সে ঐ কথাগুলি বলিল এবং তৃতীয়বার শেষ কথাটির সংগে সংগে কপাট পিছন দিকে সরিয়া গেল এবং তাহার প্রবেশের জন্য গুহাটি উন্মুক্ত হইয়া গেল।

প্রথমে চ্যাং ভয় পাইল। সে পালাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পুনরায় সে মনে মনে সাহস

সঞ্চয় করিল এবং ভিতরে প্রবেশ করিল। গুহায় ঢুকিয়া সে সাতটি স্থ-উচ্চ গোলাকার শিলাস্তূপ দেখিতে পাইল। ছয়টি গুহার দেওয়াল সংলগ্ন এবং সপ্তমটি মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই শিলাস্তূপ দেখিবার জন্যই কি সে এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছে?—সে ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই প্রত্যহ এই পাষাণ শিলা দেখিতে আসে না। যখন সে বাহির হইয়া আসে তখন তাহাকে এত উৎফুল্ল দেখায় কেন? না—ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুকান আছে। চ্যাং গভীরভাবে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

গুহার প্রতিকোণে এবং প্রত্যেকটি শিলাস্তূপের পিছনে ঘুরিয়া দেখিল। সর্বশেষে সে মাঝখানে অবস্থিত পাষাণ স্তূপটির কাছে আসিল। যখন সে উহার নিকটবর্তী হইয়াছে তখন তাহার পা একখানা গোলাকার মসৃণ প্রস্তর খণ্ডের উপর গিয়া পড়িল। কি আশ্চর্য! সংগে সংগে সাতটি শিলাস্তূপ ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর উহার গতি অধিকতর বাড়িয়া গেল এবং এত জোরে ঘুরিতে লাগিল যে চ্যাং উহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পর উহা ধীরে ধীরে মাটির মধ্যে গর্ত হইয়া বসিয়া গেল। যতদূর চোখ যায় সে দেখিতে পাইল ধাপে ধাপে সিঁড়ি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে।

চ্যাং সিঁড়ি বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য বসিতে বাধ্য হইল। তবুও সে তলায় পৌঁছিতে পারিল না। সে অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিল না। কারণ এই সোপানশ্রেণী তাহাকে কতদূর লইয়া যায় তাহা দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। নীচে—আরো নীচে সে চলিয়া গেল। তারপর সে একখানি সুদৃঢ় কাঠের দরওয়াজার সম্মুখীন হইল। ইহা বন্ধ ছিল। কিন্তু কোন হাতল বা তালা দিয়া বন্ধ ছিল না।

চ্যাং হাত দিয়া অনেক টানাটানি করিল এবং ভারী বুট দিয়া লাথি মারিল। কিন্তু ইহা খুলিল না। সুতরাং সে সেই কথাগুলি বলিয়া উহা খুলিতে চেষ্টা করিল। প্রবেশপথের পাষাণ দুয়ার যেমনভাবে খুলিয়াছিল ইহাও তেমনি খুলিয়া গেল।

সে ভিতরে কি দেখিল? প্রথমে চ্যাং কিছুই দেখিতে পাইল না। কারণ ভিতরের তীব্র উজ্জ্বল দ্যুতি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিল। মধ্যাহ্ন সূর্যের চাইতেও ইহা অধিকতর উজ্জ্বল মনে হইল।

যখন সেই তীব্র আলো চোখে সহনীয় হইয়া আসিল তখন চ্যাং আরো অবাক হইয়া গেল। সে জীবনে এরূপ দৃশ্য কখনও দেখে নাই। এমন কি স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। গুহার দেওয়াল সারি সারি মণিমুক্তায় সজ্জিত এবং ছাদটি বিরাট স্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত। বিচিত্র বর্ণের উজ্জ্বল আলোর ঝলক গুহার প্রতি আনাচে কানাচে প্রতিফলিত হইয়া মায়াপুরীর মত ঐশ্বর্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। গুহার মেঝে শ্বেতমর্মরে আচ্ছাদিত। উপরের স্ফটিকের ছাদ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকধারা শ্বেতমর্মর স্পর্শ করিয়া এমন এক অপার্থিব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার চেয়ে অপূর্ব কোন ছবি সে জীবনে কোন দিন দেখে নাই। আলোর পরিবর্তনের সংগে সংগে এমনভাবে দৃশ্যের পরিবর্তন হইতেছিল যেন ইহা একখানা ছবিতে ভরপুর গল্পের বই—যাহা কখনও শেষ হইবে না।

চ্যাং উৎফুল্ল হইয়া এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং একটি সরুপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সে একটি উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই মনোরম উদ্যানে আসিয়া তাহার মনে হইল সে চিরকাল এখানেই বাস করিবে। সে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল ইহার মসৃণ পথ, উচ্ছ্বসিত

ঝর্ণাধারা, উড়ন্ত প্রজাপতি ও পাখীর নৃত্য। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ক্ষুধা অনুভব করিল।

দ্রুতপদক্ষেপে সে সেই আলোকোজ্জ্বল কক্ষে ফিরিয়া আসিল; সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিল এবং সেই মন্ত্রপূত কথা বলিয়া গুহার দ্বার খুলিয়া ফেলিল। তারপর সে মুক্তির নিঃশ্বাস লইল। গরুগুলি তখনো ধৈর্যের সংগে সেখানেই ঘাস খাইতেছিল। যখন সে গরুর পাল লইয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল তখন মনে হইতে লাগিল তাহার এই গুহাদর্শন একটি মধুর স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেই দিন রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে। চ্যাং চুল্লীর সামনে অলসভাবে শুইয়া তাহার দাদীর কাছে সেই অদ্ভুত গুহার গল্প করিতেছিল। যখন চ্যাং কাহিনীর শেষের দিকে আসিয়াছে তখন বৃদ্ধা বলিল: চ্যাং, আমাকে একবার সেই বাগানে নিয়ে যাবি না? চ্যাং উত্তর করিল: নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আমি নিজেই একদিন তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব।

দুইদিন পর। চ্যাং তাহার কথা রক্ষা করিল। সে বুড়িকে গুহায় লইয়া গেল। মন্ত্রপূত কথা দ্বারা দরওয়াজা খুলিল এবং যত্নের সহিত সিঁড়ি বাহিয়া বুড়িকে সেই আলোকোজ্জ্বল কক্ষে লইয়া গেল।

চ্যাং-এর মতোই বুড়িও এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল কিন্তু চ্যাং যখন বাগানে লইয়া গেল সে আরো অবাক হইয়া গেল। যাহা কিছু সে দেখিল তাহাই পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হইল। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সে বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে চ্যাং চকিত হইয়া দেখিল যে বুড়ি কখন পিছনে পড়িয়া গিয়াছে।

সে পূর্বের রাস্তায় ফিরিয়া গেল; কিন্তু বুড়িকে দেখিতে পাইল না। সে তাহাকে ডাকিল কিন্তু তাহার গলার আওয়াজ পাখীর গানে ঝর্ণার কলকল শব্দে ডুবিয়া গেল।

আর একবার সে বাগানের সমস্ত রাস্তা খুঁজিয়া বেড়াইল। কিন্তু বৃথা। বুড়িকে না পাইয়া সে মনে করিল, হয়তো বুড়ি বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অতএব সে দৌড়াইয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

:—দাদী আম্মা! দাদী আম্মা!—সে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সে তাহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রত্যেক স্থান খুঁজিয়া দেখিল। তাহার দাদী আম্মা যে বাড়ী আসে নাই তাহা উপলব্ধি করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। মোট কথা সে বুড়িকে গুহায়ই রাখিয়া আসিয়াছে। চ্যাং ভীত হইয়া পড়িল। বুড়ির না জানি কি হইয়াছে! সে দ্রুতপদে পুনরায় গুহার নিকটে গেল এবং সেই মন্ত্রপূত বাক্য উচ্চারণ করিল। কিন্তু হায়! সেই কথায় দরওয়াজা একটুও নড়িল না।

পাছে তাহার দাদী আম্মা চিরকালের জন্য গুহায় আবদ্ধ হইয়া থাকে সেই ভয়ে চ্যাং বিমূঢ় হইয়া গেল। সে বার বার সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল; কিন্তু দরওয়াজা তেমনি নিশ্চল রহিল। তারপর সে লাঠির দ্বারা আঘাত করিল এবং পা দিয়া লাথি মারিতে লাগিল। অবশেষে সহসা দরজা খুলিয়া গেল।

চ্যাং দ্রুত গুহায় ঢুকিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সামনে সেই বুড়া লোকটিকে দেখিয়া থামিয়া গেল: বুড়া বলিল: আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি? তোমার হাবভাবে মনে হচ্ছে তুমি এদেশের রাজা। : আমি ভিতরে প্রবেশ করতে চাই—চ্যাং উত্তর করিল। : কিন্তু কেন? : আমার দাদী আম্মা ভিতরে রয়েছে যে। আমার ভয় হচ্ছে সে একা বের হয়ে আসতে পারবে না।—চ্যাং বলিল। : ও! তা-হলে তোমরা এখানে আগেই এসেছিলে?—বৃদ্ধ মন্তব্য করিল। : হ্যাঁ,—চ্যাং আস্তে কথাটি

উচ্চারণ করিল—কিন্তু আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আমি কেবল ছবি দেখেছি ও বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার দাদী আম্মাকে এ-কথা বলতেই সে দেখতে চাইল। তাই তাকে আজ নিয়ে এসেছি। এখন আমি তাকে নিয়ে যেতে চাই। : তোমার দাদী মা আর বাড়ী ফিরে যাবে না। বুড়া লোকটি বলিল—আমি যাদুকর ইয়াম ইয়াম। আমার অনুপস্থিতিতে সে এই গুহা পাহারা দেবে। পাছে অন্য কেউ আর না আসতে পারে।

: অনুগ্রহ করে একবার তাকে দেখতে দিন—চ্যাং অনুনয় করিতে লাগিল। : না:, কিন্তু বছরে একবার তোমায় আমি এই গুহায় প্রবেশের অনুমতি দিতে পারি। তখন ইচ্ছা করলে তাকে তুমি দেখতে পাবে।

চ্যাং কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল : মেহের-বানী করে তাকে আমার সংগে যেতে দিন।

: তা' হয় না যাদুকর গম্ভীরভাবে উত্তর করিল। : কিন্তু সে কি এখানে থাকতে পারবে?—বালক জিজ্ঞাসা করিল। : হাঁ; সে এখানেই থাকতে চায়। তার কারণ তোমাকে বলছি। এই থাকার বিনিময়ে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজপুত্র করে দেব।

: রাজপুত্র! চ্যাং বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করিল—তা কি করে সম্ভব? আমি যে একজন গরীব রাখাল!

: অপেক্ষা কর এবং দেখ। আমি যা বলছি, তা' হবেই। সংগে সংগে দরজা বন্ধ হইয়া গেল। চ্যাং তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

চ্যাং এত নিঃসংগ হইয়া পড়িল যে ক্রমে সে তাহার নিকট-প্রতিবেশীর বালিকা কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। প্রকৃতপক্ষে, এই মেয়েটি কে, ইহার পিতামাতাই বা কাহারা, তাহা কেউ জানিত না। তাহাকে দুগ্ধপোষ্য শিশুকালে একটি বনের ধারে ক্ষুধা ও শীতে ক্রন্দনরত অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু বয়সের সংগে সংগে সে অত্যন্ত সুন্দরী হইয়া উঠিল এবং চ্যাং তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

: এক বছর পর একটি শিশু সন্তান তাহাদের ঘর আলোকিত করিল। তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কিন্তু একদিন দেশের রাজা সপারিষদ সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন : আমি আমার মেয়েকে দেখতে এসেছি। আমি শুনেছি সে নাকি এখানেই আছে। কই আমার মেয়ে কই?

: আপনি হয়তো ভুল করেছেন। এখানে আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউই নেই - চ্যাং উত্তর করিল।

সেই সময় তাহার স্ত্রী দরওয়াজার নিকট আসিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন : আহা! এইতো আমার মেয়ে। আমি ওর মায়ের আকৃতিতেই চিনতে পেরেছি। সে যখন ছোট্ট শিশুটি তখনই আমাদের কাছ থেকে চুরি যায়। সে কোথায় আছে এবং বেঁচে আছে কি না তা আমরা এতোদিনেও জানতে পারিনি।

মেয়েটির ডান হাতের জন্মচিহ্ন হইতে রাজার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। কি আশ্চর্য! একজন গরীব রাখালের স্ত্রী সত্যি রাজার মেয়ে। চ্যাং, তাহার স্ত্রী এবং তাহাদের শিশু সন্তানকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল। তখন চ্যাং এর মনে পড়িয়া গেল সেই যাদুকরটির কথা। জ্যেষ্ঠপুত্র চীনের রাজপুত্র হইবে।

নতুন শপথ

॥ সৈয়দ হুমায়ুন বখ্‌ত্‌ ॥

পূর্ব তোরণে উদিয়াছে রবি আযাদী দিবসে আজ
পিছনে ফেলিয়া আঁধার রাতির গ্লানিমার শত লাজ।
অতীত দিনের দুঃখ-কালিমা পুড়াইয়া সব শেষে
আগামী দিনের চঙ্গার বারতা ঘোষিতেছে আজ হেসে।
ভুলে যাও শত লাঞ্ছনা-গ্লানি, ভুলে যাও অপমান,
একই কাতারে দাঁড়ায়ে সবাই গাও সাম্যের গান।
কেবা করিয়াছে ভুঁড়ি মোটা তার উজিরী পাইয়া দেশে,
কেবা বানায়েছে বালাখানা আজ গরীবের লহু শুষে,
আজিকে সে সব খতায়ে দেখিতে নাহি অবসর লেশ,
ভুলে যাও আজি যত ব্যথাভার, ভুলে যাও সব দ্বেষ।
দুখীর দুঃখ-দৈন্য মুছাতে, রাখিতে দেশের মান
এক সাথে যেন হাসিমুখে সব হতে পার কোরবান।
শৃঙ্খলা আর একতা-ঈমান কায়েদের মহা বাণী
জেন্দেগী ভর পালন করিবে এই কথা নাও মানি।
ভাই-ভাই বলি গলাগলি দাও আজিকার এই দিনে।
নতুন করিয়া লও সবে আজি একে অপরেরে চিনে
হাহাকার-পাপ-হিংসা-গ্লানিমা হোক সব অবসান।
মিলনের গানে আগায়ে চলুক আযাদ পাকিস্তান॥

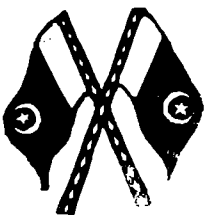

মধ্য রাতের খুন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

: আমার নাম নিখিলেশ মল্লিক। আমার একজন বন্ধু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন। থানায় এজাহারও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ দু'দিন থেকে তার কোনই খোঁজ-খবর নেই। অবশেষে বন্ধু-পত্নীর অনুরোধে আপনার কাছে আসতে বাধ্য হলাম।

: কিছু মনে করবেন না। জানতে পারি কি, আপনি কি করেন ?

: ছোটখাটো একটা জমিদারী ছিলো··· আয় তেমন কিছু নয়। ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেড়েছে ; তাই আজ প্রায় পাঁচ বছর থেকে একটা ওষুধ-পত্রের দোকান করছি। বড় ছেলেটি আবার এল, এম, এফ, পাশ করেছে ; সেই আমার ফার্মেসীর অ্যাটেনডিং ফিজিসিয়ান।

: আপনার বন্ধুটির নাম কি, তিনি কি কাজ করেন ?

: নাম তার রেবতী মোহন রায় প্রচুর পয়সা ছিলো···বর্তমানে সে বড় স্টেশনারী দোকানের মালিক।

: ছেলেমেয়ে ক'জন ?

: বন্ধুটি আমার অপুত্রক। টাকার অভাব তার না থাকলেও শুধুমাত্র সন্তানের অভাবে বেচারার সারা নিরানন্দের ভেতর দিয়ে কাটলো।

: রেবতী বাবু কি সত্যি নিরুদ্দিষ্ট, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী গেছেন ?

গত দু'দিন আগে রাত সাড়ে পর সে দোকানের ক্যাশ মিলিয়ে নি ফিরে আসে। তার দোকানের সে দিন রাত সাড়ে নয়টার পর প দেখেছে। কিন্তু বাড়ী আসবে বলে রাস্তায় নামলো আজ দু'দিন থে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

: আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়? রেবতী বাবুর আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে আপনি কি কোন খবর দিতে পারেন আমাকে?

: তার আত্মীয়-স্বজনদের সব খবর আমার জানা নেই। আগামীকাল আমি আপনাকে আমার বন্ধু-পত্নীর বাসায় নিয়ে যাবো। তাঁর মুখ থেকেই আপনি সব বৃত্তান্ত শুনতে পাবেন। নিখিলেশ বাবু পুনরায় বললেন: শহরে দু'জন লোক পর পর খুন হলো—শ্যামলাল সাহা আর রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্‌পেক্টর প্রাণেশ বাবু। এ দু'জনের মৃত্যুর পর আমি বিশেষ চমকে উঠিনি—কিন্তু চমকে উঠলাম তখনই যখন শুনলাম রেবতী নিরুদ্দেশ হয়েছে। একটা সন্দেহের ক্ষীণ আলো আমার মনে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।

: শুধু ওই দু'টো খুনই নয়, নিখিলেশ বাবু। আরো দু'টি খুন হতো; কিন্তু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কোন কারণে।

: কি ব্যাপার বলুন তো?

: বেহালাবাদক পরিমল সেনকে অডিটরিয়াম থেকে কে যেনো গুলি করে। কিন্তু ভদ্রলোক ভাগ্যের বলে বেঁচে গেছেন। ঘটনার দিন রাত্রিতে আমি রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলাম কি না—ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ঘটেছে।

: পরিমল সেন···নামটা যেনো শোনা শোনা লাগছে।

: ভদ্রলোক চমৎকার বেহালা বাজান। দ্বিতীয় কেসটা আরো ইনটারেস্‌টিং। রায়বাহাদুর কালীকিংকর বাবুর নাম শুনেছেন তো?

: হাঁ হাঁ—নিখিলেশ বাবুর চোখ বিস্ফারিত হতে আরম্ভ করলো। সেলিম বললো: কালীকিংকর বাবুকেও খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিলো···কিন্তু তিনি বেঁচে গেছেন। সেলিমের কথা শেষ হবার আগেই নিখিলেশ বাবু সোফা ছেড়ে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কথা শেষ করে সেলিম চেয়ে রইলো নিখিলেশ মল্লিকের দিকে। ভদ্রলোকের মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেছে যেনো··· একটা অজানা ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর যেনো কেঁপে উঠলো সামান্য। মাথা চেপে ধরে সোফার ওপরে কিছুক্ষণ বসে রইলেন তিনি। তারপর সহসা আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ বাবু বললেন: চলি, সেলিম সাহেব।

পরদিন সকাল বেলা। চা-পান সমাপন করে সেলিম সিগারেট টানছে। ভয়াল চা পরিবেশন করবার সময় সেলিমকে জানিয়েছে যে, ছোটকর্তা অর্থাৎ বশির রাত্রিতে ঘরে ফেরেননি···তার শয্যা খালি দেখা গেছে। সেলিম আশ্চর্য হয়নি মোটেই। কারণ বশির চিরকালের গান-পাগলা। ওস্তাদী গানের আসর থেকে সহজে যে সে উঠবে না এবং ফিরতে হয়তো তার সকাল হবে, এ কথা সেলিম পূর্ব থেকেই অনুমান করেছে।

সেলিম ভাবছিলো নিখিলেশ মল্লিকের কথা। ভদ্রলোককে সন্দেহজনক না হলেও রহস্যময় মনে হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টোকে আলাপের প্রথম দিকে সেলিম যেমন দেখেছে, শেষের দিকে কিন্তু তেমনটি দেখেনি। রায়বাহাদুর কালীকিংকরের শংকিত জীবনের

কথা শোনার পর থেকেই যেনো ভদ্রলোকের চোখ দু'টো অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিলো। প্রাণরসের উজ্জ্বলতায় দীপ্ত চোখের তারা এবং মুখ-মণ্ডলের ওপরে যেনো নেমে এসেছিলো অজানা ভীতির শুষ্ক বিবর্ণ ছায়া। মৃত্যুর পদধ্বনি শোনার পর মানুষ যেমন হঠাৎ দার্শনিক হয়ে ওঠে, পরপারের প্রতিরোধহীন ইংগিত পেয়ে যেমন করে সে শক্তিহীন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পৃথিবীর প্রিয়জনদের প্রতি, তার আপন কীর্তির পানে—তেমনি একটা ভাব সজীব হয়ে উঠেছিলো নিখিলেশ মল্লিকের চোখ-মুখে। তাঁর শেষের দিকের একট কথা সেলিম কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না। নিখিলেশ মল্লিক বলেছিলেন - রেবতী খুন হলে জানবেন, এই সবগুলো হত্যা-রহস্যের নায়ক একজনই।

তা হলে কি নিখিলেশ মল্লিক খুনীকে চেনেন? তাই যদি হয়, তবে তিনি তখন খুনীর নাম গোপন করলেন কেন? সত্যি, বড়ই রহস্যময় মনে হয় নিখিলেশ মল্লিককে। ভদ্রলোক পাগল নন তো? তাইবা কি করে হয়?—তাঁকে তো খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে হলো। দেখা যাক, আজ হয়তো পুনরায় তিনি আসতে পারেন—রেবতী বাবুর ব্যাপারে তাঁকে আসতেই হবে। কিন্তু বশির এখনো ফিরছে না কেন? সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরী করতে করতে সেলিম ভেবে চলেছে আরো অনেক কথা। বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা। বশির তখন পর্যন্ত বাসায় ফেরেনি।

বেলা নয়টার দিকে ভাবমগ্ন সেলিম এক সময় পরিচিত পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালো। সেলিম বললো : কিরে, এতোক্ষণে তোর জলসা শেষ হলো?

আসন গ্রহণ করতে গিয়ে বশির বললো : শেষ রাতে জলসা শেষ হয়। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম বলে বাড়ী ফিরতে দেরী হলো।

: কি ব্যাপার?

: একজন ভদ্রলোক ছুরিকাহত হয়েছেন··· বোধ হয় বাঁচবেন না।

: ছুরিকাহত হয়েছেন? কে?

: ভদ্রলোকের পরিচয় পাওয়া গেলো না, কারণ তিনি সংজ্ঞাহীন। সব খুলে বলছি তোকে। এর আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে।

বশিরের খাবার প্রস্তুত হয়েই ছিলো। ভয়ালকে আদেশ করামাত্র সে বশিরের সামনে সব কিছু হাযির করলো। একটা আমলেট মুখে পুরে, আর একটার দিকে চামচ বাড়িয়ে দিয়ে বশির বলতে আরম্ভ করলো :

অনুকূল বাবুর বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন সকাল হয়ে গেছে। পথের মধ্যে লোক চলাচল তখনো শুরু হয়নি। সারারাত জেগেছি গান শুনতে শুনতে···চোখের পাতা ভারী না হলেও মাথাটা একটু ভার ভার মনে হচ্ছিলো। পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি—প্রভাতের মৃদুমন্দ হাওয়ায় বেশ আরাম অনুভব করছি। ওস্তাদজীর বেহাগ রাগের তানটা তখনো কানের কাছে গুঞ্জন করছে থেকে থেকে। লেক রোডের মোড়ে এসে হঠাৎ ভাবলাম, মেইন রোড দিয়ে বাসায় ফিরতে হলে ঘুরে আসতে হবে—সময় বেশী লাগবে। তার

চেয়ে সামনের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লে সর্টকাটে অল্পসময়ে বাড়ী ফিরতে পারবো। ঢুকে পড়লাম বৃন্দাবন সাহা লেনে। ল্যাম্প পোস্টের আলো তখনো একটা জ্বলছিলো—অধিকাংশই নিবে গেছে মধ্য রাত্রিতে। বেশ কিছুদূর চলে এসেছি। আর এক মিনিট হাঁটলেই খিজির খান রোডে এসে পড়বো। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলাম, একটি ভদ্রলোক পড়ে রয়েছেন গলির একপাশে। ভাবলাম, বোধ হয় মাতাল টাতাল হবে। কাছে গিয়ে দেখি, ভদ্রলোকের জামা ভেসে গেছে রক্তে··বাম কাঁধে একটা ছোরা বসানো। প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলাম; কিন্তু কর্তব্য স্থির করতে দেরী হলো না আমার। খিজির খান রোডে এসেই সামনে যে বাড়ীটা পেলাম, সেখানেই ঢুকে পড়ে কড়া নাড়তে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছতে মুছতে বাড়ীর কর্তা বেরিয়ে এলেন। বললাম, মাফ করবেন, আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে চাই। ঐ গলির ভেতরে একটি ভদ্রলোক খুন হয়ে পড়ে রয়েছেন—দেহে প্রাণ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে—এখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ফোন করলাম পুলিস হেড কোয়ার্টার এবং হাসপাতালে। ফিরে এলাম সেই ছুরিকাহত অজ্ঞান লোকটির কাছে। কিছুক্ষণ পর গলির মুখে জিপের শব্দ শুনে বুঝলাম, পুলিসের গাড়ী এসে গেছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ধীরেন দত্ত আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। দু'চারটে প্রশ্ন করেই তিনি কনস্টেবলদের আদেশ করলেন লাশটাকে জিপে উঠিয়ে নিতে। ধরাধরি করে লাশটা জিপের কাছে আনতেই দেখা গেলো স্ট্রেচার কাঁধে হাসপাতালের দু'জন ওয়ার্ড বয় এসে হাযির হয়েছে। মেইন রোডে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করানো হয়েছে।

হাসপাতালে ফিরে, ছুরিকাহত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিটিকে অপারেশানের জন্য ও, টি, তে পাঠানো হলো। আমরা অপেক্ষা করলাম অপারেশন থিয়েটারের বাইরে। একঘণ্টা পর সার্জন বেরিয়ে এসে তাঁর মাস্ক খুলে বললেন, অপারেশান সাকসেসফুল। কিন্তু রোগী বাঁচবে কি না সে কথা আমি বলতে পারি না। আজ বিকেলের দিকে যদি সেন্স ফিরে আসে তবে প্রোগনোসিস গুড্।

সার্জনকে প্রশ্ন করলাম: আর যদি সেন্স ফিরে না আসে?

হাত দু'টো একটু ফাঁক করে কাঁধটাকে কিছু উঁচু করে সার্জন অপরূপ মুখভংগী করে বললেন: দেন, দা প্রোগনোসিস উইল বি গ্রেভ···ভেরি গ্রেভ, আই টেল্ ইউ। তবুও সার্জনকে অনুরোধ করলেন ধীরেন বাবু: আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, স্যার। বুঝতেই পারছেন, এটা একটা পুলিস কেস। ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরে এলে তাঁর একটা জবানবন্দী আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। জবানবন্দী না পেলে এ কেসটাকে ট্যাকল করা খুবই মুশকিল হবে আমাদের পক্ষে।

সার্জন বললেন: লুক হিয়ার, উই আর নট প্রাফট্স্—ফুস মন্তর করেতো আর আমরা রোগ ভালো করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, যতটুকু আমাদের করবার রয়েছে, তা আমরা করবো···অবশ্যই করবো।

হাসপাতাল থেকে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। সেখানে একটা জবানবন্দী লিখে দিয়ে এইতো বাসায় ফিরছি।

সেলিম প্রশ্ন করলো : ছুরিকাহত ভদ্রলোকটির দৈহিক গঠন এবং চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারিস, বশির ?

বশির চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো : ভদ্রলোকটির দেহ পাতলা এবং লম্বা। মাথার চুল ক্রপ করে কাটা।

: বয়স আনুমানিক কতো হবে ?

: তা পঞ্চাশের ওপরে ছাড়া নীচে নয়··· মাথার চুলে পাক ধরেছে···কানের পাশের চুলতো রীতিমতো পাকা। কলপ ব্যবহার করবার অভ্যাস ছিলো কি না তা খুঁটিয়ে দেখিনি।

: আচ্ছা আর কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিস কি না ভদ্রলোকের মাঝে ? কপালের ডানপাশে ভুরুর ওপরে একটা কাট্‌মার্ক এবং বাম গালে একটা জড়ুল চিহ্ন ?

: কাট মার্ক লক্ষ্য করিনি। কিন্তু জড়ুল একটা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ জড়ুল আমি দেখেছি···ঠিক দেখেছি। তা তুই কি করে এসব কথা বলছিস, সেলিম ?

: গায়ে ভাগলপুরী সিল্কের পাঞ্জাবী, পরিধানে বোম্বাইএর অরোরা মিলের ধুতি আর পায়ে চকোলেট রংএর কাবুলি স্যাণ্ডেল।

: হ্যাঁ, ঠিক মিলে যাচ্ছে। আশ্চর্য, ভদ্রলোককে তুই দেখেছিস না কি ?

: অজ্ঞান অবস্থায় না দেখলেও সজ্ঞান অবস্থায় দেখেছি বলেই তো মনে হচ্ছে। তবুও মনের সন্দেহ মিটিয়ে আসা ভালো। চল, এখুনি একটু হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি।

হাসপাতালে গিয়ে রোগীকে একনজর দেখেই সেলিম চিনতে পারলো। তার অনুমান মিথ্যে হয়নি। ছুরিকাহত ব্যক্তিটি আর কেউ নয়—নিখিলেশ মল্লিক। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সেলিম বললো : নিখিলেশ বাবু গত রাত্রিতে আমার সাথে দেখা করতে এসে কতকগুলো রহস্যজনক কথা বলেছিলেন। কথা ছিলো, আজ একবার এসে ভদ্রলোক আমাকে সব কিছু খুলে বলবেন। কিন্তু আততায়ীর ছুরিকা তাঁকে চিরদিনের জন্য বোবা করে দিয়েছে। আমার মনে হয়, নিখিলেশ বাবু বোধ হয় বাঁচবেন না। ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে আমরা একজন বিরাট ষড়যন্ত্রকারীকে চিনতে পারতাম। তাঁর অবর্তমানে এখন আমাদের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হবে··· জানি না কবে এ অন্ধকার অপসারিত হবে সত্যের আলোর স্পর্শ পেয়ে।

কিছুদূর হেঁটে যাবার পর সেলিম বললো : চল, একটু ঘুরে আসি। একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে কিছু খবর সংগ্রহ করবো।

: ডাক্তারখানায় গিয়ে খবর সংগ্রহ করবি কিরে ?

: হ্যাঁ, নিখিলেশ বাবুর ছেলে একজন ডাক্তার। তাঁর ডিসপেনসারীতে গিয়ে নিখিলেশ বাবু এবং রেবতী বাবু সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা করবো।

[ক্রমশঃ]

ইন্দ্রজাল

॥ যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার ॥

●

এইবার যে খেলাটি প্রকাশ করিতেছি ইহার নাম "টুপীর মধ্য দিয়া তাস প্রবিষ্ট করা।"

টুপী ও তাসের আশ্চর্যজনক খেলার মধ্যে THE PENETRATIVE CARD বা টুপীর ভিতর দিয়া তাস প্রবিষ্ট করার খেলাটি খুবই সুন্দর। এই খেলাটি আমি জীবনে বহুবার বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি।

এই খেলাতে যে কোন একটি তাস, মনে করুন, ইস্কাবনের গোলাম একটি টুপীর ছাদের মধ্য দিয়া উপরের দিকে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই খেলাতে সিল্কের TOP HAT হইলে ভাল হয়; কারণ, টুপীর উপরিভাগ সমতল হওয়া

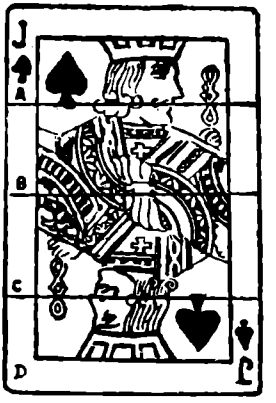

প্রথমে একটি ইস্কাবনের তাস লইয়া উহাকে ধারাল ছুরি দ্বারা তিন স্থানে সমান্তরাল তিনটি লাইন টানিতে হইবে। চিত্রে ঐ লাইন তিনটি দেখান হইয়াছে এবং ঐ লাইনের দ্বারা তাসটি A, B, C, D এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ধারাল ছুরি দ্বারা লাইন টানার উদ্দেশ্য তাসটিকে ঐ স্থানে যাহাতে অতিশয় সহজে ভাঁজ করা যায়। এরপর পূর্বোক্ত টুপীর ছাদের উপরের রংএর একই প্রকার কাল সিল্কের কাপড় ঐ তাসের পিঠে আঠাদ্বারা উত্তমরূপে লাগাইতে হইবে। এই সিল্কের কাপড় ভালরূপে শুকাইবার পর একটি ধারাল কাঁচি দ্বারা তাসের চারিদিকে যদি কাপড়ের কোন অংশ বাহির হইয়া থাকে তাহা কাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে এবং

তাসের ধার দিয়া কাল রং মাখাইয়া লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাসটিকে টুপীর উপর উপুড় করিয়া রাখিলে উহা টুপীর ছাদের রং (অর্থাৎ কাল) বলিয়া একেবারে মিশিয়া যাইবে, একটু দূর হইতে উহার অস্তিত্ব বুঝা যাইবে না। এইবার সমস্ত ঠিক হইল।

অপর একটি ভাল ইস্কাবনের গোলাম লইয়া দর্শকদিগকে দেখান হইল যে, ইহা একটি সাধারণ তাস এবং কোনরূপ কৃত্রিমতা করা নাই। যাদুকর তাহার বাম হাতে টুপীটি ধরিয়া ডান হাতে তাহার এই ইস্কাবনের গোলাম টুপীর মধ্যে ঢুকাইয়া উপরের দিকে প্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন। আসলে কিন্তু তিনি টুপীর মধ্যে তাস ঢুকাইয়া টুপীর মধ্যস্থিত লাইনিংএর চামড়ার মধ্যে ঐ তাসটি লুকাইয়া ফেলিবেন অথবা নিজের আস্তিনের মধ্যে ঐ তাসটি চালাইয়া দিবেন। বাহিরে এরূপ মুখের ভান করিবেন যে ঐ তাসটিকে তিনি ঠেলিয়া উপরের দিকে দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত দ্বারা টুপীর উপরিস্থিত উপুড় করা তাসটির A অংশ চিত্রের ন্যায় দাঁড় করাইয়া দিবেন। আবার নীচ হইতে একটু ধাক্কা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাসের B অংশ পর্যন্ত দাঁড় করাইতে হইবে। এইভাবে নীচে ধাক্কা দিয়া এবং উপরে সঙ্গে সঙ্গে উঁচু করিয়া তাসের C অংশ এবং অবশেষে D অর্থাৎ সকলের শেষ অংশটি বাহির করিতে হইবে। সম্পূর্ণ তাসটি বাহির হইবার পর যাদুকর উহাকে টেবিলের উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিবেন। যথাযথভাবে করিলে দর্শকগণ মনে করিবেন যে সত্যই যেন একটি তাস ক্রমে ক্রমে টুপীর মধ্য দিয়া উপরের দিকে বাহির হইল।

হে পাক ওয়াতান মোর
হে পাক নিশান—

॥ কাজী গোলাম আহ্‌মদ ॥

নাহি ভয়—নাহি ভয়—নাহি ভয়
হয়েছে আবার ওরে মক্কা-বিজয়
উড়িয়াছে পুনঃ মোর হেলালী নিশান—
সাজাও—সাজো—ওরে বাজাও বিষাণ ॥

দুর্গত-ক্ষত যত যাত্রী-সকল
মযলুম-মোহাজির আয় ক্ষীণবল—
দীন-হীন কাঙালের এই সে ওয়াতান
যেথা হাসে মানবতা—নাহি শয়তান ॥

ধর্মের বর্মে কর্মে যেথায়—
নির্ভীক চিত্তে করো নৃত্য সেথায়···।
বাদ্‌শা-ফকির যেথা সবাই সমান
নিত্য ভোরে জাগে শান্তি আযান ॥

কোটি-কণ্ঠে জাগে আজ তক্‌বীর গান···
স্বর্গীয় সৌরভে ভ'রে ওঠে প্রাণ ;—
সালাম জানাই যবে হে পাক-নিশান !
সঞ্চিত শত-ব্যথা হয় অবসান ॥

জীবনের লাগি নেবো মৃত্যু মাগি'
হেফাজত তরে তব রাত্রি জাগি'—
লংঘিব গিরি-নদী লক্ষ-জোয়ান
হে পাক ওয়াতান মোর—
হে পাক নিশান ॥

সমুদ্রের গভীরে !

॥ আবু কায়ছার ॥

সমুদ্রের অতল গহন প্রদেশ হচ্ছে সম্পূর্ণ রহস্যপূর্ণ স্থান। বৈজ্ঞানিকেরাও এখনো ভাল করে তার খবর জানতে পারেননি। তাই এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অতি কম।

সমুদ্রের গভীর প্রদেশে বাস করে সব অদ্ভুত জীবেরা। তাদের সম্বন্ধে অল্প-স্বল্প যা কিছু জানা গেছে—আজ সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

সমুদ্রের ১২০০ ফুট নীচে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না; কাজেই এই গভীরতার পর থেকে সমুদ্রের তলায় ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণীর দল তাদের আলোময় দেহ নিয়ে। তোমরা হয়তো ভাবছো—আলোময় দেহ! সে আবার কি! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ অন্ধকার জলে যে সব প্রাণী বাস করে, তাদের শরীর দিয়ে এক রকম উগ্র আলো বের হয়, যাতে চারপাশের জায়গা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এই আলোর সাহায্যেই এরা এই ভীষণ অন্ধকারে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

সমুদ্রের গভীর তলদেশের আবহাওয়া সব সময়েই অতি শান্ত আর অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বাইরের ঝড়-ঝাপ্টা কিছুই সেখানে পৌঁছতে পারে না বলে সেখানে জলের চাপ খুব বেশী।

এখানে যে সব জীব বাস করে তাদের জলের চাপ সহ্য করার শক্তি অত্যন্ত বেশী। এদের যদি কোন রকমে উপরে তোলা যায় তবে তারা তৎক্ষণাৎ মারা যায়। যে জায়গায় জলের বেশী চাপ নেই সেখানে এরা টিকতে পারে না।

অগাধ জলের এই বাসিন্দাদের রঙ সাধারণতঃ খুব কালো; কিন্তু তাদের গা থেকে এক রকম বৈদ্যুতিক আলো বের হয়। একথা আগেই বলেছি। কোন কোন জীব আবার তাদের শরীরের আলো ইচ্ছামত জ্বালাতে এবং নেবাতে পারে। আর একরকম জীব আছে যাদের মাথার সামনে থাকে মোটর গাড়ীর হেড লাইটের মত উজ্জ্বল আলো।

এক রকম আজব ধরনের মাছ এখানে দেখতে পাওয়া যায়—তাদের শরীর সাধারণ মাছের মতোই—কিন্তু চোখ দু'টো আগুনের ভাঁটার মত সব সময়ই জ্বলছে। আর এক রকম মাছ আছে—যাদের চোখ নেই বটে কিন্তু মাথার দুই ধারে ছোট ছোট জ্বলন্ত বিন্দু আছে। এক রকমের প্রাণী আছে যাদের

শরীরটা প্রকাণ্ড একটা জালার মত কিন্তু মুখটা নিতান্ত ছোট, কড়ে আঙ্গুলও তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে না।

সবচেয়ে মজার জীব হচ্ছে উদরসর্বস্ব একটি প্রাণী। এর শরীরে পেট ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। এর পেটটি এত বড় যে, নিজের আকারের একটা মাছকে সে অনায়াসেই গিলে ফেলতে পারে। আর এক

রকমের অদ্ভুত মাছ আছে—দেখতে গোলাকার। তার চিবুকের নীচে যে দাড়ি আছে তা যেন বিদ্যুতের তার—সব সময়ই জ্বলছে। এর মুখখানা অতি ভয়ঙ্কর। দেখলে আঁৎকে উঠ্‌তে হয়।

গভীর জলের এই অধিবাসীরা প্রায় সবই মাংসাশী প্রাণী। সুযোগ পেলে একজন আরেকজনকে আক্রমণ করে ঘায়েল করে। সামুক, ঝিনুক বা যে সব মৃত প্রাণী সমুদ্রের উপর থেকে নীচে এসে পড়ে এই সব এদের খাদ্য।

সমুদ্রের তলায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর রাক্ষুসে জীবগুলোর আকার যেমনি বড় স্বভাবও তেমনি বিশ্রী। এক রকম রাক্ষুসে জীব আছে, তার মাথার উপর একটিমাত্র চোখ; কিন্তু সেই চোখ আকারে খুব বড়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে তারা এই টর্চলাইটের মত চোখ নিয়ে যখন চলাফেরা করে তখন ছোট ছোট জীব-জন্তুর মধ্যে সামাল সামাল রব পড়ে যায়।

কয়েক জাতীয় মাছ আছে—যাদের নাকের ডগায় থাকে চাবুকের মত লম্বা শুঁড়। এই শুঁড়ে আবার থাকে বিদ্যুতের ঝিলিক্। কারুর গায়ে রীতিমত 'শক্' লাগে।

সাগরতলের গহন রহস্যপুরীর সব কথা সভ্য জগতে এখনো অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গেছে তাতেই আর মানুষের বিস্ময়ের শেষ নেই। অনেক জায়গায় ডুবুরী নেমে এই সব অতলের খবর জানবার চেষ্টা করছে, কিন্তু জেনেছে অতি অল্পই। তবে এইটুকু জানা গেছে—ঐ অগাধ অন্ধকার রাজ্য জুড়ে বিরাজ করছে এক বিচিত্র দেশ—সে দেশের সবই অদ্ভুত, সবই যেন বিস্ময়কর—আর সেখানকার বাসিন্দারা যে আরো কত অদ্ভুত তা ভাষায় ভালো করে বর্ণনা করা যায় না।

আসিয়াছে সেই দিন

॥ মোঃ আব্দুল খালেক জোয়ারদার ॥

ফিরে এলো সেই দিন—
যে দিনের তরে দুইশ' বছর কেটেছে নিদ্রাহীন !
পরাধীনতার বন্ধন ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছি আজ,
কাটিয়া গিয়াছে তিমির রজনী, পরেছি গরব তাজ !
গর্ব মোদের ধরে নাক বুকে আযাদ হয়েছে দেশ,
জীর্ণ বসন ছিন্ন করিয়া ধরিয়াছি নব বেশ !
আলীর রাহায় চালায়ে কদম নবীজীর ফর্মান
তামিল করিয়া গড়িব আমরা নূতন গুলিস্তান !
আবার মোদের গুলবাগীচায় ফুটিবে নূতন ফুল,
সৌরভে তার জুটিবে ভ্রমর গান গাবে বুলবুল !
ভেদাভেদ সব ভুলে যাব মোরা, অহঙ্কারের লেশ
রাখিব না কভু হৃদয়ের পাতে, ভুলিব হিংসা দ্বেষ !
পাক ওয়াতান করিতে রক্ষা জান দিব কুর্বান,
সকলে মিলিয়া বেহেস্তি ফুল ধরায় করিব দান।
ধন্য শহীদ ভাই,—
গিয়াছ দানিয়া যেই সম্পদ তুলনা তাহার নাই !
তোমাদের ত্যাগ গরিমায় গড়া এই যে পাকিস্তান,
দোআ কর—মোরা পারি যেন তার রাখিবারে সম্মান।
দিতে তোমাদের দানের মূল্য কিছু নাই আমাদের,
স্মৃতিটি স্মরিয়া দিলাম ভকতি অর্ঘ এ হৃদয়ের।

—0—

রূপকুমার

॥ বদি-উজ-জামান ॥

●

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে আরও অনেক মাঠ পার হয়ে গেলেই স্বপ্নপুর রাজ্য পাওয়া যাবে। মস্তবড় সে রাজ্য—আর অগণিত সে রাজ্যের প্রজা। সবাই সুখী। তাদের রাজাকে তারা প্রাণের চাইতেও ভালবাসতো। রাজাও প্রজাদেরকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করত। একজনের দুঃখে ওরা সবাই দুঃখিত হোত, আবার একজনের আনন্দে আর সবে যোগ দিত। এমনিভাবে হাসি-কান্না, সুখে-দুখে সবাই দিন কাটাতো।

রাজার একমাত্র ছেলে—রূপকুমার। সারা অঙ্গভরে তার ঢল ঢলে রূপ উছলে পড়ে। দুধে আলতা মিশানো তার গায়ের রঙ। মুক্তার মত দাঁত, হরিণের মত চোখ। একবার চাইলে আর চোখ ফেরান যায় না। দু'দশ রাজ্যের মধ্যে অমন সুন্দর রাজপুত্র আর নেই রাজা রাজকুমারকে তার চোখের মণির চাইতেও বেশী ভালবাসতেন। এতটুকুও আড়াল হতে দিতেন না। চোখে চোখে রেখেও তার তৃপ্তি হোত না। কিন্তু হলে কি হবে? রূপকুমারের শিকারের সখ ছিল খুব বেশী। মাঝে মাঝেই তিনি হরিণ, পাখী ও বাঘ শিকার করতে গভীর বন-জঙ্গলে চলে যেতেন অনেকদিন পর্যন্ত বনে জঙ্গলে শিকারের পিছে ঘুরে বেড়াতেন। রাজা পুত্রের নিরাপত্তার জন্য বন্দুক, কামান, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত দিতে চাইতেন। কিন্তু রূপকুমার তা না নিয়ে বলতেন: শিকার করতে যাওয়া মানেই বিপদের পথে পা বাড়ান; সেখানে যদি হাতী, ঘোড়া নিয়ে যাওয়া যায় তাহ'লে শিকারের প্রতি শিকারীর কোন মোহই থাকে না। সেখানে আনন্দ পাওয়া যায় না। এজন্য রাজার মনে কম দুঃখ ছিল না।

সেবারে রূপকুমার তার প্রিয় পংখীরাজ ঘোড়া নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অনেক বন, উপবন, পাহাড়, পাথার পার হয়ে রূপকুমারের পংখীরাজ বাতাসের আগে ছুটলো। মেঘেরা ছায়া দিয়ে রাজপুত্রের অপূর্ব কান্তি রোদ থেকে বাঁচাতে সাথে সাথে যায়। শেষে রূপকুমারের পংখীরাজ এক নাম-না-জানা বনে এসে থামলো। গভীর বন। বনের এপার থেকে ওপার কতদূর তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। দিন-দুপুরেও সেখানে সূর্যের আলো কোন দিন পৌছায়নি। অন্ধকারে ভরা। কাক জ্যোৎস্নার মত আবছা আলোয় সারা বনের সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখা যায়। আম গাছে বড় বড় মিষ্টি লিচু, জামগাছে সুন্দর সুন্দর আঙ্গুর, পেয়ারা গাছে কাদি কাদি কলা, এমনি আরও কত জানা অজানা ফলে গাছগুলা ভরা। রূপকুমার মিষ্টি ফল খেতে খেতে

বনের ভিতরে পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যা হতে থাকলেই রূপকুমারের চমক ভেঙে যায়। শত সহস্র দৈত্যের মত অন্ধকার নাম-নাজানা বনটিকে ঝাপটে ধরে। বন থেকে বের হতে রাজপুত্র পথ ভুল করে অন্ধকারে ছুটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কোন দিকেই সে পথের চিহ্ন পায় না।

গভীর রাত। শ্রান্ত হয়ে রূপকুমার এক গাছের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হিংস্র পশুর দল আড়াল থেকে বের হয়ে শিকারের খোঁজে সারা বন জুড়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। মাঝে মাঝে আক্রান্ত পশুর আর্তনাদ সূচীভেদ্য অন্ধকার চিরে আসছে। দূরে সহস্র কণ্ঠের সুমধুর সুরের মূর্চ্ছনায় রূপকুমারের তন্দ্রা কেটে যায়। স্বপ্নাবিষ্টের মত অনেকক্ষণ ভেবে সুর লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে। অনেকক্ষণ ঘুরা-ঘুরির পর এক জায়গায় আলো দেখতে পেয়ে রূপকুমার সেইদিক্ লক্ষ্য করে যেতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে রূপকুমারের পাখাবাজ এসে যায়। ঘোড়া থেকে নেমে রূপকুমার একটা গাছের আড়াল থেকে আলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখতে থাকে। গভীর বনের ভিতরে এমন দৃশ্য সে কল্পনাও করতে পারে নি। সম্মুখে সুন্দর ফুলের বাগান—চারি দিকে সারি সারি ফুলের গাছ। নানা রঙ-বেরঙের প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ আর সৌন্দর্যে পাগল হয়ে কতশত ভ্রমর গুনগুন করে বাগান জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভ্রমরের গুঞ্জন ধ্বনিই দূর থেকে সংগীত বলে মনে হয়। বাগানের ঠিক মাঝখানে পাঁচটি অদ্ভুত রকমের বড় বড় ফুল। ফুলের মাঝখানে একটি করে অপূর্ব সুন্দর মানুষের মুখ। এত সুখকর পরিবেশের মধ্যেও তারা হু হু করে কেঁদে যাচ্ছে। পাঁচটি ফুলের কোনটির গাছ, পাতা গাঢ় নীল, কোনটির হালকা সবুজ, কোনটির বেগুনী—এমনি নানারঙের। বাগানের ওপারেই এক বিরাট অট্টালিকা। কোথায়ও জনমানবের সাড়া নেই। অট্টালিকার সকল দরজা-জানালা বন্ধ। অট্টালিকার সম্মুখে এক থামের উপরে মাণিক জ্বলছে। তারই আলোকে দশ দিক্ আলোকিত। সেটা সাত রাজার ধন।

রূপকুমার অভিভূত হয়ে এই সব আশ্চর্য কাণ্ড দেখছে। এত দিন শিকার করে আসছে, কিন্তু এই রকম অপূর্ব ও অলৌকিক দৃশ্য কোন দিন সে দেখে নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত রূপকুমার মানুষ ফুল-গুলোর দিকে এগিয়ে যায়। ফুলগুলোর খুব কাছে এলে একটা ফুল কান্না থামিয়ে রূপকুমারের দিকে চেয়ে বলে উঠে :

কোন্ গো দেশের রাজার কুমার
কি-ইবা তোমার নাম ?
ডাইনী বুড়ির বনে কেন
কি-ইবা তোমার কাম ?
জানের প্রতি দরদ যদি
একটু তোমার থাকে,
পালাও পালাও আর দেরী নয়
এই সুযোগের ফাঁকে।

কিন্তু রূপকুমার সাহস সঞ্চয় করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাগান, ফুল, অট্টালিকার কথা জানতে চাইলো। অনেক বলার পর মানুষ-ফুল শেষে সব কথা খুলে জানায়। তার নাম ফুলকুমারী। অচীন রাজ্যের রাজার একমাত্র মেয়ে। ডাইনী বুড়ি তাকে রাজবাড়ী থেকে চুরি করে এনে এখানে ফুল করে রেখেছে। অপর চারটি ফুল বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রের দেহ থেকে করা হয়েছে। আর পাশের ফুলগুলো সব রাজপুত্রদের সাথে আসা সৈন্যসামন্ত। ডাইনীর হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায়ও ফুলকুমারী বলে দেয়। অট্টালিকার পিছনে আছে এক দুধ-সাগর। ওখান থেকে পানি এনে এই সব গাছে ছিটিয়ে দিলেই সবাই পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে পাবে। কিন্তু বিপদ হ'ল ডাইনী প্রায় সব সময়েই ঐ দুধ-সাগরের পাশে বসে

চরকায় সুতো কাটে। দিন রাত্রের মধ্যে সে মাত্র কয়েকবার বাগানে মন্ত্র পড়া পানি ঢালতে আসে। ফুলকুমারী রাজপুত্রকে সময়ের কথাও বলে দেয়।

রূপকুমার সব শুনে অট্টালিকার পিছনে অনেক খুঁজে দুধ-সাগর পায়। আড়াল থেকে রূপকুমার দেখে—এক থুরথুরে বুড়ি বসে চরকায় সুতো কেটে যাচ্ছে। অনেক সময় পরে বুড়ি উঠে এক কলসি পানি নিয়ে কি যেন বিড় বিড় করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিল। তারপর অট্টালিকার মধ্যে ঢুকে গেল। রূপকুমারের বুঝতে বাকী রইল না যে, এখনই বুড়ি বাগানে পানি ঢালতে চলে গেল। অমনি হাতের কাছে কিছু না পেয়ে রূপকুমার তার মুকুটেই দুধ-সাগর থেকে পানি নিয়ে অনেক দূরে বাগানে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে যে বুড়ি সব গাছেই এক ফোটা করে পানি ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। সব গাছে পানি দেয়া হয়ে গেলে বুড়ি যাওয়ার আগে একবার ফুল কুমারীর দিকে চেয়ে ফোক্‌লা গালে হেসে চলে গেল।

আবার ফুলের বাগানে কান্না শুরু হ'ল। রূপকুমার সুযোগ বুঝে চট করে বাগানে ঢুকে ফুলকুমারীর দিকে পানি ছিটিয়ে দেয়। অমনি রূপকুমারের চোখ ঝল্‌সে যায়। অপূর্ব সুন্দরী ফুলকুমারী সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ফুলকুমারীর কথায় রূপকুমারের মোহ ছুটে যায়। তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে অন্যান্য সব ফুলের উপর ছিটিয়ে দেয়। ফুলকুমারীর পাশের চারটি ফুল থেকে হয় আনন্দ সুন্দর চারজন বলিষ্ঠ রাজপুত্র। বাগানের ছোট ছোট গাছে পানি ঢালতেই তারা রাজপুত্রদের সাথে আনা সৈন্যের রূপ নেয়। আর একটু সময়ও তারা ডাইনী বুড়ির বাগানে থাকতে চাইল না। সকলেই যার যার ঘোড়ায় চড়ে চলতে থাকে। রূপকুমার তার পংখীরাজে ফুলকুমারীকে বসিয়ে নেয়। চলে আসার আগে রূপকুমার সাত রাজার ধন মাণিক নিয়ে যেতে ভুল করে না। মাণিকের আলোক-ছটায় চারদিক্ দিনের আলোর ন্যায় পরিষ্কার দেখা যায়। পথে রূপকুমার চার রাজপুত্রের কথা শোনে। ওরা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন সময়ে শিকার করতে নাম-না-জানা বনে ঢুকে পড়ে। কিন্তু বন থেকে বের হতে না পেরে অনবরত ঘুরতে থাকে। পরে ডাইনী বুড়ির নজরে পড়লে ওদের উপর মন্ত্র-পড়া পানি দিয়ে ফুল গাছ করে এই বাগানে ধরে রাখে। একশ বছর হলে ডাইনী গাছগুলো কেটে কুচি কুচি করে ফেলে নিজের জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে।

বনের মধ্যে কয়েকদিন খুঁজে রূপকুমার দলবল সহ বের হতে পথ পায়। রাজপুত্রেরা রূপকুমারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চার জনে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চার পথে চলে যায়। রূপকুমার ফুলকুমারীকে নিয়ে ছুটতে থাকে স্বপন পুরের দিকে।

বৃদ্ধ রাজা দীর্ঘ দিন নয়নের মণি একমাত্র পুত্র রূপকুমারকে না দেখে কেঁদে কেঁদেই আকুল। সকল প্রজাই রাজার শোকে শোকার্ত। রাজ্যে হাহাকার পড়ে যায়। চার দিকে রূপকুমারের খোঁজে লোক-লস্কর পাঠান হয়েছিল। কিন্তু তারা সব নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে। কোথায়ও তার সন্ধান

পাওয়া যায়নি। স্বপনপুরের এমনি এক দুঃখের দিনে রূপকুমার ফুলকুমারীকে নিয়ে রাজপুরীতে এসে যায়। রাজা ছুটে আসে, রাণী ছুটে আসে, দাসী-বাঁদী সব ছুটে আসে। রূপকুমারের কাছে শিকারের সকল কাহিনী শুনে রাজা পুত্রকে জড়িয়ে ধরে, রাণী ফুলকুমারীকে বুকে তুলে নেয়।

খবর পেয়ে অচিন দেশের রাজা এসে যায়। রাজ্য জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে থাকে। দুই রাজার সম্মতিতে একদিন স্বপনপুরের রাজপুত্র রূপকুমারের সাথে অচিনদেশের রাজনন্দিনী ফুলকুমারীর বিয়ে হয়। দিকে দিকে খুশীর হিল্লোল পড়ে যায়। রাজ্যসুদ্ধ মণ্ডা, মিঠাই, সন্দেশের ছড়াছড়ি। কে কয়টা খায়!

রূপকুমার মালা গড়িয়ে তাতে সেই সাত রাজার ধন মাণিক লাগিয়ে ফুলকুমারীর গলায় পরিয়ে দেয়।

নবদম্পতিকে স্বপনপুরের রাজা-রাণী ঘোষণা করে বৃদ্ধ রাজা অবসর নেয়।

আশার কথা

॥ নূরুল আবসার ॥

মন্টু দাদা ভন্টু দা'কে
বললে কি মা জানো?
—চাঁদে নাকি দেশ রয়েছে,
সত্যি তুমি মানো?
খুব সুন্দর মানুষ না কি
সেই দেশেতে রয়,
তারা না কি নতুন সুরে
নতুন কথা কয়।
সে দেশ না কি অনেক ভাল
ধরার দেশের থেকে,
ফ্রান্সে নেমে তারা না কি
দুনিয়া গেছে দেখে।
সে দেশ যদি এতই ভালো
যায়নি মানুষ কেন?
মানুষ হয়ে চুপ থাকা যায়
জড়টি হয়ে হেন!
বড় হলে আমিই যাবো
চাঁদের দেশে ঠিক
তখন আমি নয় কো খোকা
বড় বৈজ্ঞানিক।

এসো খেলার কথা শোনাই

॥ আবদুস্ সালাম ॥

এটা কোন্ খেলার সিজন? প্রশ্নটা শুনে বীরদর্পে মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়েই একটা খেলার নাম শুনিয়ে দিতে পারো। তোমার প্রিয় খেলা কোন্‌টি? তা'হলেও হয়তো উত্তর দিতে দেরী করবে না। সবগুলো খেলার নাম মনে মনে একবার আউড়ে নিয়ে পরে একটা কিছু বলে দেবে। ধরে নিলাম ফুটবল খেলাটাই তুমি বেশী পছন্দ কর, আর ওটিই হচ্ছে তোমার প্রিয় খেলা। আচ্ছা যদি প্রশ্ন করা যায়, বলতো তোমার প্রিয় খেলাটার জন্মস্থান কোথায়? আর যুগে যুগে তার কিইবা উন্নতিসাধন হয়েছে? —এর জবাব দেওয়াটা কিন্তু সত্যি চাট্টিখানি কথা নয়। তবে শোন, আমিই বলছি সব কথা। মনে রেখো।

ফুটবল খেলা প্রথম কোথায় খেলা হয় বা কোথায় এর জন্মস্থান তা' অবশ্যি কেউ ঠিক করে বলতে পারেন না। তবে এ ব্যাপারে নানামুনির নানা মত আছে। কেউ বলেন: 'চীনেই এর জন্ম। আর এখানেই প্রথম খেলা হয়।' তাঁরা প্রমাণ দেখান, চীনের কোনো রাজা নাকি লোহার একটি গোলাকার পিণ্ডে লাথি দিয়েছিলেন। সেই থেকেই হয় এ খেলাটার শুরু। রোমের কথা বলেন অনেকেই। তাঁরা প্রমাণ দেন, রোমের রাজা যুদ্ধে-পরাজিত বন্দীদের মাথা কেটে মাঠে নিয়ে সেগুলিকে পা' দিয়ে লাথি মারতেন। সেই থেকেই ফুটবল খেলার প্রচলন হয়। ইংল্যাণ্ডের কথাও কারও মুখে শোনা যায়। তাঁরাও বিভিন্ন প্রমাণ দেন।

যাক্‌গে, আসল কথা বলি। যীশুখৃস্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে প্রথম খেলাটার সূত্রপাত হয়। তখন অবশ্যি এর নাম 'ফুটবল' ছিলো না। প্রাচীন গ্রীসে হারপাসটিন নামে একপ্রকার খেলা হ'ত। সে খেলাটা বর্তমান ফুটবল খেলার মতোই। কিন্তু তাহলেও উভয়ের মধ্যে অনেক রকমের তফাৎ ছিলো। আজকাল-কার মতো গোলপোস্ট, গোলকীপার বা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়-সংখ্যাও ছিলো না। দু'পক্ষে অনেক লোক নামতো খেলার মাঠে। বলটাকে অর্থাৎ গোলাকার একটা পুটলিকে এক পক্ষের লোক বিপক্ষ দলের গাঁয়ের সীমানা পার করে দিলেই গোল হ'ত। অর্থাৎ তাদের জয় হ'ত। এ সব অবশ্যি পুরান কথা।

যীশুখৃস্টের জন্মের প্রায় ২১৭ বছর পর 'ফলিস' নামক একপ্রকার খেলার কথা জানতে পারা যায় প্রাচীন পুস্তক 'ডাবিব' এবং 'চেস্টারে'। এ খেলাটাও খেলতে হ'ত পা দিয়েই; কিন্তু গ্রীসের রাজা কোন কারণ বশতঃ এর প্রচলন উঠিয়ে দেন দেশ থেকে। পুরান বই পত্তর ঘাঁটলে পাওয়া যায় এসব কথা। পূর্বাপর সম্বন্ধ রেখে পণ্ডিতেরা বিচার করে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, রোমই ফুটবল খেলার আদি জন্মস্থান। রোম দেশের লোকেরাই এর প্রচলন করে দেয় গ্রেটবৃটেনে।

১১৫৪ সাল থেকে ১১৮৯ সাল পর্যন্ত খেলার ইতিহাস দেখলে দেখা যায় এই সময়ের মধ্যে বিলেতে খেলাটার এত বেশী প্রচলন হয় যে, লোকেরা কাজকাম বাদ দিয়েই খেলা শুরু করে দিত। সৈন্যেরাও তাদের তীর-ধনুক ছেড়ে মাঠে নামত বল নিয়ে। ফলে হল কি, সৈন্যেরা তীর চালানো ভুলতে লাগলো। রাজা দ্বিতীয় হেনরী দেখলেন মহাবিপদ! সৈন্যেরা তীর চালানো ভুলে যাচ্ছে খেলায় মেতে থেকে। তিনি বুদ্ধিমানের মতো খেলাটা দিলেন উঠিয়ে।

দ্বাদশ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি খেলার প্রচলনটা প্রায় উঠেই গেল; কারণ দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর আর বহুদিন এ খেলায় কেউ হাত দেয়নি।

দ্বাদশ খৃস্টাব্দের পরে আবার ধীরে ধীরে শুরু হয় খেলাটা। তখনও খেলা হ'ত দু'গাঁয়ের মধ্যেই। এ সময়ও পুরান নিয়ম প্রচলন ছিলো খেলাতে। বিপক্ষ গাঁয়ের সীমানা পার করে দিলেই হ'ত গোল। খেলা হ'ত অনেক লোক মিলে। বুঝতেই পাচ্ছ দু'গাঁয়ের অধিকাংশ লোকই খেলায় যোগ দিতো। ব্যাপারটা তখন কি হ'ত বুঝতেই পারো। অনেক লোক পায়ের চাপা পড়ে মরতো। আহতদের সংখ্যাও মন্দ ছিলো না। আর মাঠের আশেপাশের বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট বন্ধ না করলে বড় মুস্কিল হ'ত।

কিছুকাল পর খেলাটার আরও উন্নতি হয়। তখন খেলোয়াড়দের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা করা হয় এবং ঠিক করা হয় কোনো দলে ৫০ জনের বেশী খেলোয়াড় থাকতে পারবে না। তখনও এর নাম ফুটবল খেলা হয়নি। তখন নাম ছিলো 'দি ব্লাডার'।

১৬০৩ সালে বিলেতে আবার তীরন্দাজ কমে যায় 'দি ব্লাডারের' বিষম প্রচলনের দরুন। তাই রাজা মিঃ জেম্‌স খেলাটা দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে দেশবাসীর আকুল প্রার্থনায় তা তিনি স্থগিত রাখেন এবং সৈন্যদের মধ্যে একটা নিয়ম বেঁধে দেন।

ছাত্রদের মধ্যেই খেলাটার বেশী প্রসার লাভ করে। আর তখনই এর নাম হয় **'ফুটবল'**। আরো দু'টো নামও এর হয়—**'রাগবি'** আর **'সকার'**। ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত রাগবি ফুটবলই বেশী খেলা হ'ত ছাত্রদের মধ্যে। রাগবি একটু অন্য ধরনের খেলা। মানে, বলটা গোলের কাছে আসতেই খেলোয়াড়েরা সেটাকে হাতে করে বিপক্ষদলের সীমার বাইরে ছুঁড়ে দিতো। অনেকে আবার খেলার সময় বল হাতে ধরা ঠিক মনে করতো না। তারা শুধু পা দিয়েই খেলতো। তাদের খেলার নাম ছিলো 'সকার'।

১৮৪৮ সালে ইটান, হ্যারো, উইন চেস্টার প্রভৃতি নামকরা খেলোয়াড়গণ মিলে ফুটবল খেলার একটা আইন প্রচলন করেন। কিন্তু ১৮৬২ সালে আবার সেই আইনটাকে সংশোধন করে নেওয়া হয়। আগের আইনটার নাম হচ্ছে, 'কেম্ব্রিজ রুল'। পরবর্তী আইনটিই হচ্ছে বর্তমান আইনের অসংশোধিত রূপ।

খেলাটা বিলেতে প্রসার লাভ করার সাথে সাথেই অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন

হতে থাকে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে হতে থাকে নানারকমের 'ফুটবল ক্লাব'।

ইল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক একটি ফুটবল এসোসিয়েশনও ইতিমধ্যে হয়েছিলো। আন্তর্জাতিক খেলার বিজয়ীগণ পেতো 'এফ এ' কাপ। আর এ থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

লীগ খেলার নামও তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। এর জন্মদাতা মিঃ উইলিয়াম ম্যাকগ্রেগর। ১৮৮৮ সাল থেকেই শুরু হয় লীগ খেলা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কিন্তু খেলাটা প্রায় উঠেই গিয়েছিলো। পরে যুদ্ধ থামবার সাথে সাথে নোতুন উদ্যমে আবার শুরু হয় ফুটবল খেলা।

১৯০৬ সাল থেকে শুরু হয় অলিম্পিক ফুটবল খেলা। অবিভক্ত ভারতে ফুটবল খেলা শুরু হয় ইংরেজ আমল থেকে। প্রথম খেলাটা হয় আইল্যান অব্ বোম্বে এবং বোম্বে মিলিটারীদের মধ্যে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশেই ফুটবলের প্রচলন খুব বেশী হয়েছে। গ্রাম হতে গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে অবাধ গতিতে।

আষাঢ়ীর এই দিনে

॥ মোহাম্মদ আজিজুল হক্ চৌধুরী ॥

কবির স্বপন—শিল্পীর ছবি—প্রাণের আষাঢ়ী মম
বছর পারিয়ে এলে ফের দ্বারে প্রিয় মেহমান সম!
হারায়ে তোমায় ক্ষণেকের তরে মণিহারা ফণী হয়ে
ভ্রমিলাম কতো গহন তিমিরে—শংকিত মনে ভয়ে!
বারেকের তরে দিইনি নিবিতে হৃদয়ের দীপ-শিখা,
বার বার মোরা পুড়াতে চেয়েছি—অসহ ললাট-লিখা!
যুঝেছি আমরা শতবার কতো মীরজাফরের সনে—
ঘুচাতে চেয়েছি লাঞ্ছনা এই জীবনের ক্ষণে ক্ষণে!
মোদের বুকের খুনে রাঙা হলো এই মাটি কতোবার,
বন্দী জীবন শেষ হলো কত—সাক্ষী এ কারাগার!

পাক-ভারতের শ্যামলিমা হায়—সিপাহীর তাজা খুনে—
লালে লাল করে দিল গো তোমার বিনিময়ে—
পাবে শুনে।

স্বদেশ প্রেমের বহ্নি-শিখায়—দহিয়া কত না প্রাণ
চলে গেছে সেই বীর শহীদান করি পথ-দিশা দান।
সে হুতাশনের স্ফুলিঙ্গ পড়ে সারা দেশবাসী-মনে—
ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল সে কী যে বেদনার আলোড়নে!
ঝড়ের ঝাপটে তাদের প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, তবু—
জীবন-সুধায় জ্বলিল যে আলো—ব্যর্থ হয় নি কভু!

এতো যে শোণিত আহুতির পরে আসিলে হে "স্বাধীনতা",
মুছিয়া ফেলেছি তাই এই দিনে অতীত-হৃদয় ব্যথা!
নব-জন্ম লভি' শুভদিনে শুধু করে নেবো এই পণ ঃ—
এ আযাদী লাগি' দেবো প্রাণ যদি হয় কভু প্রয়োজন!
ভরে দেবো মোরা গরীবের মুঠি সাধ্যে যেটুকু পারি—
রিক্ত জীবন লয়ে পথে ঘুরে—ঘুচাবো দুঃখ তারি।
অবনত শিরে সহিছে নীরবে পীড়ন যে পলে পলে—
যাদের গোপন ব্যথারে হেরেছি বেদনার আঁখি-জলে,
ভাষা দেবো মোরা তাদের মুখেতে—মুছাবো অশ্রুবারি,—
তুলে দেবো করে হেথায় তাহারা যেটুকুর অধিকারী!
তবে তো সফল হবে আজিকার এই আযাদীর দিন—
শত শহীদের রুধির হবে না কভু গৌরবহীন!

যোগাযোগ

তোমাদের চিঠির জবাব দেব বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। কিন্তু পাশেই চিঠির ডাঁই দেখে আর কলম ধরতে ইচ্ছে করে না। চিঠি লেখাটাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই মনোযোগ সহকারে এড়িয়ে এসেছি, যেমন এড়িয়েছি নিয়মিতভাবে অঙ্ক স্যারের ক্লাস। তাই অঙ্ক কষা আর চিঠি লেখা আমার কাছে এখনও সমান আতঙ্কের কারণ। যাক্, নিজের গুণকীর্তন আর নাই-বা করলাম। চিঠির জবাব তো আমাকে লিখতেই হবে; কেননা তোমাদের যে আগেই কথা দিয়েছি।

তার আগে দু'টো কাজের কথা বলে নিই। শ্রাবণ সংখ্যা আলাপনী ঠিক যে সময়টিতে বের করার কথা ছিল, ইচ্ছা করেই আমরা সেই সময় তা করিনি। কারণটা তোমাদের বোধ হয় বলে দিতে হবে না; কেননা আযাদী দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা আলাপনী হয়ত তখন তোমাদের হাতেই থাকবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, আলাপনীতে যারা লেখা পাঠাও তাদের অনেকেই রচনার শেষে বা আগে নিজের নাম-ঠিকানাটা দাও না, দাও চিঠিতে। এতে আমাদের একটু অসুবিধা হয়; কেননা হঠাৎ চিঠিটা তোমাদেরই গল্প কবিতার অরণ্যে কোথাও হারিয়ে গেলে, নাম-ঠিকানাবিহীন রচনার মালিককে খুঁজে বের করা বেশ একটু মুশকিলই হয়ে পড়ে, কি বল। তাই এখন থেকে সবাই সাবধান হবে আশা করি।

আচ্ছা, এবারে সাহস করে কয়েকখানা চিঠি তুলে নিই। লিখেছেন—

O সৈয়দ আজহারুল হোসেন, খান্দুরা হাবিলী, ত্রিপুরা।

—আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। দেখুন, আলাপনী একটি মাসিক পত্রিকা। এখানে "চল্‌তি খবরের" বিভাগটি, যার কথা আপনি বলেছেন, খুব উপযোগী হবে বলে আমাদের মনে হয় না। তাছাড়া আজকের দিনে ছোট-বড় সবাই অল্পবিস্তর খবরের কাগজটা পড়ে। "গতসংখ্যা আলাপনী" শীর্ষক যে বিভাগটি খোলার পরামর্শ দিয়েছেন তার উপকারিতা স্বীকার করে নিলেও বর্তমানে কর্মীর সংখ্যাল্পতা ও সাংগঠনিক অসুবিধার দরুন আরম্ভ করা যাবে না। তবে উক্ত পরামর্শ আমরা মনে রাখব ভবিষ্যতের জন্য। আপনার অনেকগুলো লেখা আমাদের হাতে এসেছে। "উসা খাঁ নদী" ও "টেনুর জন্য গল্প" মনোনীত হয়েছে। সবগুলো অবশ্য এখনও দেখা হয় নাই। আপনাদের মনে রাখা উচিত যে বছরে আলাপনী পত্রিকা বের হয় মাত্র বার সংখ্যা। আর কম করে হলেও প্রতি সংখ্যায় দু'তিন শ' লেখা থেকে আমাদের বাছাই করতে হয়। সুবিচার হয়ত সব সময় করতে পারি না। তবুও চেষ্টা করি কচি ভাই-বোনদের সমান সুযোগ দেওয়ার। তাই মনোনীত হলেই যে প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা ছাপতে হবে এমন কথা দিতে পারি না।

O নিয়ামত হোসেন। দৌলতপুর, খুলনা।

—আগামী সংখ্যা আলাপনী বের হলে আমাদের তিনটি বছর পূর্ণ হবে। আলাপনীর প্রথম সংখ্যা অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাছাড়া পুরো এক বছরের বাঁধানো হিসেবেও বের করা হয়েছে।

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে", কিন্তু এই কচি কিশোরদের মানসিক পুষ্টির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে ছিলো উপযুক্ত একখানি কিশোর পত্রিকার অভাব। আর তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

পূর্ব বাংলার বাইরে এই পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান ও লণ্ডনে পাঠানো হয়। আলাপনী ছাড়া অন্য কোন পত্রিকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের মনে হয়, আলাপনী ছাড়া কোন কিশোর মাসিকই নিয়মিত বের হয় না। তবে সবুজ সেনা, ইয়ং পাকিস্তান প্রভৃতি পত্রিকা এখনও টিকে আছে।

আপনার "দোকানদার" কবিতাটি মনোনীত হয়েছে।

আপনি অন্য যে দু'টো প্রশ্ন করেছেন তার জবাব আমরা দেব না; কারণ ওগুলো আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

O বিজু প্রসাদ মিত্র, হাটসিবগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

—তোমার কবিতাগুলো অমনোনীত হয়েছে। অভিযোগ করেছ কেন ধাঁধার পাতায় তোমার প্রেরিত ৫৮টি নাম ছাপা হয় নাই। সমস্ত নামই যে ছাপতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যতগুলো সম্ভব আমরা ছাপতে চেষ্টা করি।

O বেগম সুরাইয়া চৌধুরী (১০৬৩), সিবচর, ফরিদপুর।

—লিখেছেন আমাদের ব্যবহারে ভরসা পেয়ে কবিতা পাঠিয়েছেন। সত্যিকথা বলতে কি, আমরা অযাচিত প্রশংসা পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। আপনার "প্রার্থনা" কবিতাটি মনোনীত হয়নি। আশা করি লেখবার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আপনার বাড়বে বই কমবে না।

O আসাদুল হক মঠবাড়িয়া, বরিশাল।

—অনেক কবিতা লিখেছেন, বেশ ভাল কথা তো। পাঠিয়ে দেবেন। ফটো আর জীবনী ছাপাবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? আত্মপ্রকাশ ভাল, কিন্তু আত্মপ্রচার নিন্দনীয়।

O এম, কামরুল আহসান, মুলাদী হাইস্কুল।

—গত সংখ্যায় কোন একজনকে লেখা চিঠিটা একটু বড় হয়েছিল বলে অভিমান করেছ। কিন্তু কি করব, বল। তার সব কথার তো জবাব দিতে হবে। আচ্ছা যাক্: নিজের লেখার সুপারিশ তুমি নিজেই করেছ। লিখেছ "আমার লেখা অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়।" সে ত খুব সুখের কথা! কিন্তু জানত, "আপনারে বড় বলে বড় সে নয়…।" তাছাড়া আমাদেরও কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তাই কথাটা না লিখলেও পারতে। হ্যাঁ, তোমার "তরুণের পণ" মনোনীত হয়েছে আর "দৃষ্টিপাত", "অভিমান" মনোনীত হয়নি।

O শ্রীদেবদাস বর্ধন, ময়মনসিংহ।

—"শ্যামলী" কবিতার বিষয় কিশোরদের অনুপযুক্ত বিধায় অমনোনীত।

O শাম্মী নাসরিন, নওয়াবগাছা, পাবনা।

—"খেলাঘরের স্মৃতি" আগামী সংখ্যায় প্রকাশ লাভ করতে পারে। "ভানসিংএর দিঘী" লেখাটা পেয়েছি।

O মোঃ আবু তাহের মজুমদার (৯০৩) নোয়াখালী; সৈয়দ আবদুল মঈদ (১১৮৮); আবুল কালাম মোঃ নূরুল আমীন (১১৪২); বুলবুলি—সাতক্ষীরা।

—তোমাদের কবিতাগুলো ভাই মনোনীত হয়নি। আমাদের ওপর রাগ করে একেবারে কলম ছেড়ে দিও না কিন্তু।

আচ্ছা আজকের মত শেষ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো সকলের জন্য।

শপথ

॥ নাসিরুদ্দীন আহমদ ॥

বজ্র কঠোর শপথ নিয়েছি আজ—
স্বদেশের লাগি হাসিমুখে দেবো প্রাণ।
মোদের আকাশে জানি সে লোলুপ বাজ
ওত্ পেতে করে সুযোগের সন্ধান।

সোনার এ দেশে আমরা জ্বালিব আলো,
যালিমের বুক গুঁড়া করি শত খান।
জীবনের চেয়ে স্বদেশেরে বাসি ভালো,
ধন্য আমার সোনার পাকিস্তান।

আত্মকলহে মত্ত হবো না মোরা,
বিভেদের মাঝে কবর রয়েছে জানি,
একতার স্বাদ আনিব বিশ্ব জোড়া
আমরা কিশোর সত্যের সন্ধানী।

হেথায় যাহারা কাঁদিছে নিত্য দিন,
ক্ষুধার তাড়নে তিলে তিলে দানে প্রাণ,
ব্যাধি ও জরায় দিনে দিনে হোলো ক্ষীণ,
তাহাদের লাগি করিব আত্মদান।

দীন ও মজুর কিষাণের মুখে হাসি
আমরা ফুটাব, দানিব উদ্দীপনা,
তারা যে দেশের শক্তি উৎস রাশি,
নিজেরে দানিয়া এঁকে যায় আল্পনা।

সোনার এ দেশে নব সন্ধ্যার লাগি
বিরামবিহীন সাধনা করিব মোরা,
দেশের স্বার্থে হাসি মুখে সব ত্যাগি
উদ্দাম বেগে এগিয়ে চলেছি মোরা।

ম্যাজিক শেখ

যাদুরাজ এস, ডি, মুখার্জী

একটি নুতন তাসের খেলা -

আযাদীর দিনে তাসের একটা ভাল খেলা যাতে তোমরা দেখাতে পার সেইজন্য আজ একটা নূতন খেলা তোমাদের লিখে পাঠালাম। প্রথমে যাদুকর এক প্যাকেট সাধারণ তাস বা'র করে দর্শকদের দিলে ও বললে, "এই তাসের প্যাকেট থেকে চারখানা বিবি বা'র করে দিন—।" দর্শকগণ তোমার হাতে চারখানা বিবি দেবার পর তুমি সকলে যাতে দেখতে পান এমন স্থানে সেই চারখানি বিবিকে সাজিয়ে রাখলে। তারপর তুমি দর্শকদের বললে, "আপনারা এর মধ্যে থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বিবি select করবেন এবং সেই বিবিটির জুড়ী আর একটি বিবি আমি পূর্ব থেকেই একটা খামের ভিতর (মুখবন্ধ) রেখে দিয়েছি এবং ঐ খামটি সকলের চোখের সামনে রাখলাম।" এবার তুমি একটা "ছক্কা" সাজিয়ে তোমরা লুড়ো মেল, বার করলে এবং একজনকে ঐ ছক্কাখান দিতে বললে এবং যত নম্বর তাতে উঠেছে সেই নম্বর ঐ চারখানা বিবির উপর দিয়ে গুণে তুমি একটি বিবি দেখিয়ে বললে "আপনারা এই বিবিটিকে পছন্দ করেছেন এবং আমি পূর্ব থেকেই এ কথা জানতাম বলে ঐ খামে ওর duplicate বিবি রেখেছিলাম।" এই কথা বলে সকলের সামনে খামের মুখ ছিঁড়ে ঐ বিবিটি বার করে সেটি দেখিয়ে পকেটে রেখে স্টেজ থেকে বা দর্শকদের কাছ থেকে চলে যাবে।

এখন খেলাটি কি করে করতে হবে জানতে পারলে; কিন্তু মূল কৌশলটা জান না, সেইটাই বলছি —

প্রথমেই বলে রাখি তাসের প্যাকেটের তাসে, খাম, ছক্কা বা যার উপর ঐ বিবি চারটি আটকে রাখছো তাতে কোন কারচুপি নাই। দরকার হলে এগুলো সকলকে পরীক্ষা করতে দিতে পার। যত কারচুপি সবই রয়েছে চারখানা তাস সাজান, গোনা ও খামের ভেতর duplicate তাসে।

১। তাস সাজাবে বামে রুইতনের বিবি, তারপর ইস্কাবনের বিবি, তারপর হরতনের ও সর্বশেষ অর্থাৎ তোমার ডাইনে চিড়ার বিবি।

(ক)	যদি	ছক্কাতে	১	উঠে	ডাইনে	থেকে	১	গুনে	চিড়ার বিবি তুলবে
(খ)	ঐ	ঐ	২	ঐ	বাম	হতে	ঐ		ইস্কাবনের বিবি তুলবে
(গ)	ঐ	ঐ	৩	ঐ	ডান	হতে	ঐ	ঐ	ঐ ঐ
(ঘ)	ঐ	ঐ	৪	ঐ	বাম	ঐ	ঐ		চিড়ার বিবি তুলবে
(ঙ)	ঐ	ঐ	৫	ঐ	ডান	ঐ	ঐ	২য় বারে	ইস্কাবনের ঐ ঐ
(চ)	ঐ	ঐ	৬	ঐ	বাম	ঐ	ঐ	২য় বারে	ইস্কাবনের বিবি ঐ

২। খামের ভেতর যে বিবিটি আছে সেটি আসলে চিড়ার বিবি ; কিন্তু কাল কালি দিয়া বিবির ২য় মুখের পাশের ফোঁটা চিড়াকে ইস্কাবন করা হয়েছে এবং যখন যেটা দেখাবার প্রয়োজন সেই ফোঁটাটি খোলা রেখে অন্য অংশ আঙ্গুলে চাপা রেখে তাস বার করে এনে দর্শকদের দেখালেই চলবে। সাবধান—এই তাসটি যেন ভুলেও দর্শকের হাতে দেখতে দিও না। যদি তোমরা খেলাটি না বুঝে থাক আলাপনীর সম্পাদকের মারফৎ অথবা আমার বাড়ীর ঠিকানায় (২০এ দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলিকাতা—২৬) পত্রালাপ করতে পার, আমি আমার যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করবো।

নূতন ধাঁধাঁ

১। জন্ম দিয়ে পিতা পলাইল
মাতা হল বনবাসী,
যার পুত্র সেই পেল
দিন কয়েক কষ্ট পেল
পাড়া-প্রতিবেশী।
—সুলতানা নিলুফ

২। রূপ নাই, তবু কেহ মোরে কু-রূপ
না বলে,
জন্ম-মৃত্যু নাহি মোর এ মহীমণ্ডলে।
সবার কাছে যাই আমি, নাহি
বাধবিচার।
ঠিক করে বল দেখি কি নাম আমার।
—শ্রী প্রতাপ চন্দ্র বসু

গত মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। 'লেখা' পড়া শেষ করে 'খালে' যায় গণি,
বিপরীত' দিকে 'তরী' দেখিল অমনি।
'জলে' নেমে 'লেজ' নাড়ি জল খায় গরু,
'লতা'য় জড়িয়ে গেছে তীরে 'তাল' তরু।
'দীন'নাথ 'নদী' পানে চলে শিশুসনে,
শিশুটির 'নাম' 'মনা' জানে সর্বজনে।

২। 'পা'

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম :

ঢাকা—

আজমল হোসেইন, ইফতেখার হোসেইন, রওশন আখতার—ধানমণ্ডাই। ফিরোজা মমতাজ

—কে, পি, ঘোষ স্ট্রীট ; ইউসুফ, আজীজ, ইকবাল, মহসীন—কোর্ট হাউস স্ট্রীট ; নরেশ সাহা—রেকাবী বাজার।

ফরিদপুর—

হেলেনা ইসলাম—উদয়পুর ; বেগম সুরাইয়া চৌধুরী—শিবচর।

চট্টগ্রাম—

মোস্তাক, মুরু. ওমর, যতীন—চান্দগাঁও মিল্লাত ক্লাব ; শ্রী অনিল নাথ—মুরাদপুর ; আবুল মনসুর মোঃ আবু মুছা—ফতেপুর ।

পাবনা—

শহিদ সরওয়ারুদি খান—সনতল ; এম, এম, ইলতুৎমিস্—দৌলতপুর হাই স্কুল।

রাজশাহী—

নাসির, ভোলা, আমজাদ, গিয়াস, সাইফ, খালেক, বাবুল, রশীদ, মহসীন, জালাল, কাশেম—উলিপুর কর্মিভবন। এম. মজিবর রহমান—নওগাঁ হাই স্কুল ; আফজাল হোসেন—নওগাঁ ;

বরিশাল—

কামরুল আহসান—মুলাদী ; সাজেদা খানম চৌধুরী—বেপটিস্ট মিশন স্কুল ; সুশান্ত কুমার ঘোষাল—গারুড়িয়া উচ্চবিদ্যালয় ; মজিবল, জলিল, দেলওয়ারা, আনোয়ারা, আমির— চরাদী তরুণ সংঘ, রাণীর হাট।

রংপুর—

মোহাম্মদ আবদুল করীম—গাইবান্ধা হাই স্কুল।

দিনাজপুর—

হুমায়ুন, হাসীম, বাবলু, তসলিম, মছলু, মজিবর—পীরগঞ্জ ; কুদ্দুস, আমিনুল, মনোয়ারা, রিজিয়া, মমতাজ, লতিফা—জাগরণী ক্লাব, বড়বন্দর ; শেলী, মামুন, নাজলী—ঠাকুর গাঁ।

খুলনা—

ইজাজ হোসেন— ফুলতলা হাই স্কুল।

যশোহর—

মোহাম্মদ আলী—ঝিনাইদাহ্

সিলেট—

শংকর সরকার, সুলেখা সরকার, সন্ধ্যা সরকার।

ময়মনসিংহ—

নীলু, কমল, মাসুম, মলয়, সলিল. সাহানা, মামুন, মায়া—টাংগাইল ; এম, আমজাদ হোসেন—তিলকপুর হাই স্কুল ;

বগুড়া—

আবুল ফাতাহ্ এ, আর খন্দকার—বগুড়া সেণ্ট্রাল হাই স্কুল।

নোয়াখালী—

সিরাজ উদ্দীন আহমদ (১১৩১)—কানকির-হাট ; রাজ্জাক, আবদুল, দেলওয়ার, এনামুল—কানকির হাট হাইস্কুল।

ত্রিপুরা—

সৈয়দ আজহারুল হোসেন, ইয়াহ্ইয়া বখ্ত, ইকবাল, কামাল, মুরাদ, আজাদ, রোকেয়া, রাণী।

কুষ্টিয়া—

মোজাহারুল হান্নান—আমঝুপী ; মোঃ মনিরুল ইসলাম ; কিউ, জে, মুস্তারী, বি, জে, হুসেরা, কে, টি, এস, ইসলাম, কে, জেড, এম, ইসলাম।

মেদিনীপুর—

প্রতাপ চন্দ্র বসু, তমলুক ।

সেরা পাকিস্তান

॥ ব'নজীর আহমদ ॥

প্রিয় পাকিস্তান আমাদের
সেরা পাকিস্তান ॥

চাঁদ-তারা সাথে আরো জেগেছে দিবাকর
আর্ জেগেছে তক্‌দীর—ভালের 'পর
জংগল—মরু-ভূ' আর সাগর—
জেগেছে সারা জাহান।
প্রিয় পাকিস্তান আমাদের
সেরা পাকিস্তান ॥
খুশীতে সকল হৃদয় মিলে এক হয়েছি
আর্ খুশী হয়েছে···আবাদ হয়েছি—
মানে,—আমরা সবাই আযাদ হয়েছি—
পূর্ণ হয়েছে মনস্কাম।
প্রিয় পাকিস্তান আমাদের
সেরা পাকিস্তান ॥
আমাদের সে' সবুজ-সাদা প্রিয় পতাকায়
চাঁদ-তারা যার 'পরে চম্‌কায়···
কতো উঁচু আমাদের তক্‌দীর—সারা দুনিয়ায়—
গর্বিত আপন সম্মান।
প্রিয় পাকিস্তান আমাদের
সেরা পাকিস্তান ॥
মিথ্যা আর ধোকা থেকে কভু নাহি ডর
আস্‌লে সময় যেনো সে সুযোগে হেসে মর···
যেনো পতাকার মান হীন নাহি কর—
উঠুক লক্ষ তুফান।
প্রিয় পাকিস্তান আমাদের
সেরা পাকিস্তান ॥

—০—

[৫৩০-(খ) পৃঃ পর]

গিয়েছিল। রবি আমায় বললে : যা তো ভাই, জল নিয়ে আয়।

উঠলাম। জল আনতে হবে। দেখি, বালতি-ভরা জল—সুন্দর, টলটল করছে। টিউব-ওয়েল থেকে আনা ব'লে মনে হ'ল। দুজনেই অবাক। ভূতুড়ে কাণ্ড, বালতি তো খালি ছিল! বনের মধ্যে টিউব-ওয়েল কোথায়!

আজ সারা দিন কী শুরু হয়েছে। রবিকে শেষ রাতের ঘটনা সব খুলে বললাম। দু'জনেরই কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সবাই এসে হাযির হ'ল। কিন্তু নিবারণের পাত্তা নেই। বালতির জলের ব্যাপারটা রবি সকলকে বলল। সকলে ঠাট্টা করতে লাগল : যত সব ভীরু জুটেছে।

চতু বললে : আমরা কাজ না ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি ব'লে আমাদের ভয় খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা, বুঝলি না?

নন্তু ছাড়া সকলেই বুঝতে পারল। হঠাৎ-খোঁড়া উনুনের কথা তার মনে পড়ে থাকবে!

সন্ধ্যা হ'লে রান্না নামল। কলার পাতায় ক'রে সকলকে খেতে দেওয়া হ'ল। সকলকে পরিবেশন ক'রে রবি বসল। এক সঙ্গে ছ'জন খাচ্ছি, শুধু নিবারণ আসেনি। বোধ হয়, ঠাণ্ডার কথা ভেবে এবং তার বাবার ভয়ে সে বাড়ী চলে গেছে। খাওয়ার আয়োজন মন্দ হয় নি—খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, আলু-কপির ঝোল, ডিমের ডালনা। রবি সত্যি ভাল রান্না করে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় দুলু বললে : একটু চাটনি আর একটা ক'রে সন্দেশ থাকলে একেবারে রাজকীয় আহার হত।

কি আশ্চর্য, বলার সাথে সাথে একটা মাটির গামলায় চাটনি আর কলাপাতায় ছ'টা রাজভোগ এসে হাযির। ভয়ে আমাদের ভিরিমি লাগার যোগাড়।

এমন সময় নিবারণের গলা শুনলাম, সে বলছে : ভয় পাস্‌নে। আমি এখানে আছি।

ও, তা' হলে নিবারণ এগুলো এনেছে। কিন্তু তাকে তো দেখতে পেলাম না। আমাদের সম্মুখে সে এগুলো দিয়ে গেল কখন? আমাদের মনের কথা আগে থেকে আন্দাজ ক'রে এগুলো আনল কেমন ক'রে? এই জঙ্গলের মধ্যে এগুলো পেলে কোথায়? আমরা খাওয়া ভুলে এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নিবারণের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীতের সন্ধ্যা, তার উপর চারদিকে গাছপালা, লতাপাতা। গাছের সঙ্গে নিবারণের দেহ যেন মিশে গেছে। অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না। আমার কুকুর বাঘা আমাদের সাথে এসেছিল। চেয়ে দেখি, সে অসার হয়ে পড়ে আছে।

আমি বললাম : নিবারণ, সারাদিন কোথায় ছিলি?

সে বললে : তোমাদের সাথে সাথেই তো আছি ভাই।

: সারাদিন তোকে দেখতেই পেলাম না। এমন কি খাওয়া-দাওয়া শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত এলি নে।

: আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে ভাই, আর খাব না।

বুঝলাম, বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে আসার সময় চাট্‌নি আর রাজভোগ এনেছে। তাকে বললাম: এখানে এসে বস।

তাকিয়ে দেখি, কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। বাঘা শুধু কেঁউ কেঁউ করছে।

শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সকলেরই মনটা আতঙ্কিত, গা'টাও কেমন যেন ছমছম করছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে সকলে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। খানিক দূর গিয়ে মনে হ'ল—যা, ছুরিটা তো আনি নি। কি সুন্দর ছুরিটা ছিল! অন্ধকারে আর কেউ ফিরে যেতে চাইল না। তার উপর আবার সবার মনে একটু ভয় ঢুকেছে।

শীতের সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে চারদিকে অন্ধকার জমাট বেঁধে নামল। চলতে চলতে মনে হ'ল—এ পথ দিয়ে তো আসিনি। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আধ ঘণ্টা ধ'রে চলেছি, বন তো ফুরায় না।

সন্তু বললে: আমরা পথ হারিয়ে ফেলে ভুল পথে চলছি না তো?

চেয়ে দেখি—যেখানে চড়ুই ভাতি করেছি, সেখানেই এসে হাযির হয়েছি। উনুনটার পাশে নন্তু দাঁড়িয়ে আছে। দুলুর ভয় একটু বেশী; সে তো প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের অবস্থাও খুব ভাল নয়। এমন সময় মুশকিল-আসানের মত নিবারণের গলা শুনতে পেলাম: এই নে তোর ছুরি।

হাত বাড়িয়ে ছুরিটা নিয়ে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু কোথায় সে? ঐ যে, সে আগে অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশে চলেছে। আমরা তার পিছে পিছে জোরে জোরে চলতে চলতে ডাকলাম: নিবারণ, নিবারণ।

দূর থেকে নিবারণের কণ্ঠ ভেসে এল: আমার সাথে আয়।

খানিকক্ষণ তার পিছে পিছে চলার পর তাকে আর দেখতে পেলাম না। সামনে চেয়ে দেখি, পরিচিত বড় রাস্তায় এসে পড়েছি। নিবারণকে সবাই মিলে ডাকাডাকি করলুম, উত্তর পেলাম না। তার ব্যবহারে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম; শেষ রাত্রি থেকে তার সারাদিনের ব্যবহারটাই কেমন যেন হেঁয়ালিতে পূর্ণ।

* * * *

শহরে এসে পৌঁছলাম। বাড়ীর কাছে এসে পানুর সঙ্গে দেখা; পানু আমাদের সহপাঠী। তার মুখ শুক্‌নো গম্ভীর বিষণ্ণ। আমাদের দেখে সে বললে: হাঁ রে, তোরা কোথা থেকে আসছিস? মনে হচ্ছে পিকনিক ক'রে ফিরলি?

আমরা বললাম: হাঁ, কেন, কি হয়েছে?

: নিবারণের খবর জানিস না নিশ্চয়ই? তোরা তো তার বন্ধু। জানলে নিশ্চয়ই পিকনিকে যেতিস না।

আমি বললাম: নিবারণের আবার কি হ'ল? সে তো একটু আগেও আমাদের সাথে ছিল।

: কি বাজে বকচিস? কাল দুপুরে নিবারণ তোদের সাথে স্নান করতে গিয়েছিল। সেই সময় নৌকা থেকে বার বার ঝাঁপ দেওয়ার ফলে তার বুকে আঘাত লাগে; ফুসফুস দু'টোরই খুব ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় ভিজে কাপড়ে নদী থেকে বাড়ী এসেছে; তারপর বাজারও করেছে। এতে অসুখ আরো বেড়ে যায়।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম: হাঁ, আমি যখন তাকে দেখতে যাই, তখন নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

পানু ব'লে চলল: হাঁ, তুই যাবার অনেক পরে সব ব্যাপার টের পাওয়া যায়। রাত্রি ন'টার সময় তার মা তাকে জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় দেখেন। তারপর তার শ্বাসকষ্ট আর জ্বরের অবস্থা দেখে রাত্রি দশটার সময় ডাক্তার ডাকতে লোক যায়। ভিতরে ভিতরে অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে, তা কেউ বুঝতে পারে নি। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় ডাক্তার আসেন। পরীক্ষা ক'রে জানা গেল—ডবল নিউমোনিয়া; দু'টো ফুসফুসই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সারা রাত যমে-মানুষে টানাটানি। ভোরের কিছু আগে একটু অন্ধকার থাকতেই নিবারণ মারা গেল।

আমরা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে এই অসম্ভব গল্প শুনছিলাম। কথা শেষ হতে না হতেই আমরা সব এক সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে উঠলাম: মা—রা গে—ল।

পানু বললে: মরার আগে তার মুখের শেষ কথা: পি—ক—নি—ক।

পানুর শেষ কথাগুলো শোনার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। তাড়াতাড়ি হাতের জিনিসগুলো রেখে নিবারণের বাড়ীর দিকে দৌড়ালাম। কিন্তু নিবারণের মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা মনে করার কোন উপায় ছিল না। পুত্রহারা জননীর বুকফাটা আর্তরব তখন সমস্ত আকাশ-বাতাসকে নিশ্ছিদ্র বেদনায় ভ'রে তুলেছে। নিবারণের বাড়ীর সম্মুখে স্থানুর মত অচল হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। শোক-দুঃখ-বেদনা-আতঙ্কে তখন আমরা স্তব্ধ, অসার, জড়ীভূত।

॥ মোহাম্মদ আবদুল করীম, নবম শ্রেণী ॥

১। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী কোন্‌টি ?—National Library (Kiel U. S. S. R), পুস্তক সংখ্যা ৭,৯৭,০০।

২। সবচেয়ে বৃহৎ প্রাসাদ কোন্‌টি ?—রোমের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ।

৩। সবচেয়ে বড় সেতু কোন্‌টি ?—Sanfrancisco এর ওকল্যাণ্ড ব্রিজ (সাড়ে চার মাইল লম্বা এবং দ্বিতল)।

৪। পৃথিবীর বৃহত্তম ও প্রাচীনতম বৃক্ষ কোন্‌টি ?—California র সেকোইয়া ন্যাশনাল পার্কের জেসারাল শার্মান বৃক্ষ। ইহার বয়স ৪৮০০ বৎসর।

৫। কোন্ দেশে কয়েদীদিগকে কাজ করিবার জন্য রীতিমত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ?—সাইপ্রাস দ্বীপে।

৬। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বকায় ব্যক্তির নাম কি ?—ইংলণ্ডের জেফিরি হাড্‌সন।

৭। বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্র নাথের ছদ্মনাম আছে কি ?—হ্যাঁ, ভানুসিংহ।

৮। সবচেয়ে কোন্ পাখী সুন্দর গান করে ?—উত্তর আমেরিকার মকিং বার্ড।

দাঁড়ের কবিতা

॥ মেনহাজ উদ্দীন চৌধুরী ॥

চুপ কর্, শোন্ শোন্, বেয়াকুল হোস্‌নে,
ঠেকে গেছি বাপ্‌রে কী ভয়ানক প্রশ্নে!
ভেবে-ভেবে লিখে-লিখে বসে-বসে দাঁড়েতে,
ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।
এক ছিল দাঁড়িমাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল!
কাক বলে রেগেমেগে, "বাড়াবাড়ি ঐ তো?
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি
তবে রে—
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস কবে রে?
পাখা হলে 'পাখী' হয় ব্যাকরণ বিশেষে,
কাঁকড়ার 'দাঁড়া' আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি 'দ্বারী' কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখী সব তবে দাঁড়ি হয়!
দূর! দূর! ছাই দাড়ি! দাঁড়ি নিয়ে
পাড়ি দে!"
দাঁড়ি বলে, "বাস্ বাস্! ঐখানে দাঁড়ি দে!"

সম্পাদকের দফ্‌তর

১৪ই আগস্ট আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় দিন। ১৯৪৭ সালের এই দিনে পরাধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করে আমরা স্বাধীন হয়েছি। আযাদীর দশম বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে আগামী ১৪ই আগস্টে।

স্বাধীনতার উৎসবের দিনে আমাদের স্মরণ করা উচিত সেই সব মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে আমরা স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই প্রতিজ্ঞাই করতে হবে যেন আমরা স্বাধীন জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। স্বাধীনতার যে চারাগাছ তাঁরা রোপণ করেছেন তাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করার দায়িত্ব আমাদের।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—কিশোর-কিশোরীদের দায়িত্ব কতটুকু? আমাদের মনে হয় তোমাদের দায়িত্ব কাউরও চেয়ে কম নয়। তোমরাই আগামী দিনের জাতির কাণ্ডারী। নেতা বল, বৈজ্ঞানিক বল, ডাক্তার বল, ব্যবসায়ী বল সবাই তোমাদের মধ্যে থেকেই বেরুবে। তোমাদের মিলিত প্রচেষ্টাই জাতিকে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই এখন থেকেই চাই তার প্রস্তুতি। জ্ঞান আহরণ ও চরিত্রগঠন তোমাদের জীবনের অন্যতম ব্রত হওয়া উচিত। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে তোমরা, তোমাদের দায়িত্ব অনেক। আযাদী উৎসবের আনন্দ আর হাসির মাঝে যেন হারিয়ে না যায় তোমাদের কর্তব্যের আলোকবর্তিকা—লক্ষ্য যেন থাকে ঠিক, নিষ্ঠার আভায় যেন দীপ্ত হয়ে উঠে তোমাদের মুখ।

* * * *

পরিণত বয়সে এবং পূর্ণ সম্মানের মধ্যে মহামান্য আগা খান গতমাসে জেনেভায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে হাযার হাযার ইসমাইলী সম্প্রদায়ের লোক আছেন তিনি ছিলেন তাঁদের ধর্মীয় নেতা। যে গুটিকয় মানুষ দেশকালের সীমার উর্ধ্বে উঠে বিশ্বজনের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন আগা খান তাঁদের অন্যতম।

পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে আগা খান কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল করাচী। কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কোন দেশের

সীমারেখায় বাঁধা পড়েনি। তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব তার অন্যতম নাগরিককে হারিয়েছে।

আগা খানের ধর্মীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর ২০ বৎসর বয়স্ক জার্ভাডে-পড়া নাতি প্রিন্স করিম।

* * * *

গত ১লা জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বৎসর শুরু হয়েছে। ভূ-প্রকৃতি ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণাদির দ্রুত উন্নতি হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা আগের চেয়ে আরও ব্যাপক আকারে ভূ-প্রকৃতি ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এই সময়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের আয়োজন করেছেন। পাকিস্তানসহ প্রায় ৭০টি দেশ এই প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছে। গত ৮০ বছরের মধ্যে এই সব ব্যাপারে দুইবার বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল—একবার ১৮৮২—৮৩ ও আর একবার ১৯৩২—৩৩ সালে।

প্রধানতঃ এই গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মূল বিষয় হচ্ছে তিনটি—পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ও উপরিভাগ, আবহাওয়া এবং যে সকল শক্তি পৃথিবীর গতি-প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে, যথা চুম্বক শক্তি, মেরু জ্যোতি ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রায় দেড়শত বৈজ্ঞানিক এই ভূ-প্রাকৃতিক বৎসরের পরীক্ষা নিরীক্ষায় যোগ দিয়েছেন। যদিও নাম দেওয়া হয়েছে ভূ-প্রকৃতির "বৎসর" তবুও এর কার্যকাল প্রায় ১৮ মাস স্থায়ী হবে।

* * *

হাযার বছর আগে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনকে পুত্র পরিজন সাথে যে নির্মম মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তারই শোকাবহ স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে এই মহর্‌রম মাস। মহর্‌রম মাস তাই শোকের মাস, মাতমের মাস। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা ধর্মের আচার আর অনুষ্ঠানের মহড়ায় আসল উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেলি। তাই শোক প্রকাশের নামে যখন উৎকট বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি তখন লজ্জায় আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। আচারের খোলস ছাড়িয়ে অন্তরের নির্যাসটুকুর সন্ধান করাই প্রকৃত মানুষের কর্তব্য।

আলাপনীর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলি যথাক্রমে বাঁধাই পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক বাঁধাই সংখ্যার দাম—৪৲টাকা